বরুণকুমার চক্রবর্তী

প্রগল্প

বরুণকুমার চক্রবর্ত্তী

অপর্ণা বুক ডিষ্ট্রিবিউটার্স
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (দোতলা)
কলিকাতা-৭০০০০৯

PRAGALPA
(A collection of stories related to Provorbs)
By : Barun Kumar Chakraborty

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, (জানুয়ারী ১৯৮৬)

দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৮

প্রকাশিকা :
শ্রীমতি আরতি জানা
প্রযত্নে অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (দোতলা)
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর :
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ শিল্পী : অমিয় ভট্টাচার্য

বারো টাকা

ডাক্তার শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

অশেষ শ্রদ্ধাভাজনেষু

এই লেখকের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক অন্যান্য বই :

- বাংলা লোক-সাহিত্যচর্চার ইতিহাস (২য় সংস্করণ)
- বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র (২য় সংস্করণ)
- লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার (২য় সংস্করণ)
- লোক-সংস্কৃতি : নানা প্রসঙ্গ
- লোক-উৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ

প্রাক্‌কথন

প্রায় বছর আষ্টেক আগে 'বাংলা লোক-সাহিত্যচর্চার ইতিহাস' নিয়ে কাজ করার সময় বাংলা প্রবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু মনোজ্ঞ গল্পের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ ঘটে। তখনই মনে হয়েছিল এরকম গল্পগুলি সংগ্রহ করে একটি সংকলন করা যেতে পারে। কারণ তাতে একদিকে যেমন বেশ কিছু প্রবাদ বা প্রবাদমূলক বাক্যাংশের উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যাবে, তেমনি অপরদিকে বেশ কিছু উপভোগ্য কাহিনী বা ঘটনা পাঠককে উপহার দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু সে ইচ্ছা নানা কারণেই আর বাস্তবায়িত হয় নি। এর কয়েক বছর পরে 'বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র' গ্রন্থটি রচনা করার সময়ে নতুন করে পূর্বের ইচ্ছা দানা বাঁধে। অবশ্য এর একটা কারণও ছিল তা হ'ল এই গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে নতুন আরও বেশ কিছু প্রবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাহিনী নজরে আসে। যাই হোক পরবর্তীকালে পরিকল্পনাটিকে বাস্তবায়িত করতে আরও একটু সক্রিয় হয়ে দেখা গেল কাজটি খুবই শ্রমসাধ্য। কেন না একমাত্র অভিধানকার সুবলচন্দ্র মিত্র এই বিষয়ে কিছু কাজ করেছিলেন আর পরবর্তীকালে চন্দ্রভূষণ শর্মামণ্ডল নামে জনৈক ব্যক্তি 'প্রবাদ পথ' নামে পুস্তিকায় (১৯২৫) কতিপয় প্রবাদের উৎস কাহিনী সীমিত পরিসরে রচনা করে গেছেন। এছাড়া বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু কিছু আলোচনা যা মিলল, তাতে আর যাই হোক মোটামুটি ভাবে একটি সংকলন প্রস্তুত করা চলে না। সুতরাং অনুসন্ধান চালাতে হল আরও ব্যাপকভাবে, বিশেষ করে প্রাচীন পত্র-পত্রিকার পাতায়। ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ভারতী, অর্চনা, আর্য্যাবর্ত্ত, বামাবোধিনী ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা অনুসন্ধান করে কিছু রসদ মিলল, তাছাড়া মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা,' রেভারেণ্ড লঙের 'প্রবাদমালা' এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে রচিত ও প্রকাশিত পত্রিকা বা গ্রন্থাদি থেকেও কিছু উপকরণ সংগৃহীত হল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে বর্তমান গ্রন্থে

সন্নিবিষ্ট কাহিনীগুলির কোনটিই স্বকপোলকল্পিত নয়, প্রতিটি কাহিনী বা সূত্র পূর্বসূরীদের কাছ থেকে সংগৃহীত। অনেক ক্ষেত্রেই প্রাপ্ত কাহিনীর কাঠামোটিকে সুপরিণত গল্পে রূপ দেওয়ার অবকাশ ছিল। কিন্তু ঐতিহ্যের মর্যাদা রক্ষাকল্পে আনুপূর্বিক পরিবর্তন কিংবা রূপান্তর কিছুই করা হয় নি। অনেকক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট কাহিনীটি না জানা থাকার ফলে সেই কাহিনী থেকে উদ্ভূত প্রবাদের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। সেই কারণে বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত কাহিনীগুলি যে সেগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রবাদগুলির প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধিতে পাঠকের সহায়ক হবে, সেই আশা করা যায়। তাছাড়া, ইংরেজিতে এই ধরণের গ্রন্থ থাকলেও এ পর্যন্ত আমাদের বাংলা প্রবাদের উৎপত্তিসূচক কাহিনী-গুলির কোন সংকলন ছিল না। ফলে বহু প্রবাদের উৎস কাহিনী ইতিমধ্যেই যেমন বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, তেমনি যেগুলি সংগৃহীত হতে পারে সেগুলি অনতিবিলম্বে সংগ্রহ করতে না পারলে তাদেরও একই অবস্থা হবার সম্ভাবনা। সেদিক থেকে বর্তমান বক্ষ্যমান গ্রন্থটি প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। এ পর্যন্ত গেল গ্রন্থ রচনার ইতিহাস। এবারে সংকলিত কাহিনীর প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য রোদনপ্রিয়তা সম্পর্কে দীর্ঘদিন ব্যাপী যে প্রচার চলে এসেছে, তা যে তার পূর্ণ পরিচয় নয়, আংশিক পরিচয় মাত্র, বাংলা প্রবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাহিনীগুলিই তার প্রমাণ। বাঙ্গালী যে রসিক, হাস্যনিপুণ পরিহাস প্রিয়তাতেও যে তার জুড়ি মেলা ভার, বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কাহিনীগুলির পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করবেন। আরও উপলব্ধি করবেন, বাঙ্গালীর গল্প রচনার নৈপুণ্যকে।

সংকলিত গল্পগুলি থেকে শুধু যে বিশেষ কয়েকটি প্রবাদ অথবা প্রবাদমূলক বাক্যাংশের উদ্ভব সম্পর্কে জানা যাবে তাই নয়, গল্পগুলি থেকে জানা যাবে সমসাময়িক সমাজ জীবনের নানা খুঁটিনাটি তথ্য। যেমন, বর্ণাশ্রম প্রথা সেকালের সমাজের মানুষ নিষ্ঠা সহকারে মেনে চলতেন, শ্রম বিভাগকেও গল্পে সমর্থন জানানো হয়েছে। এই কারণে তাঁতী তাঁত বোনা ত্যাগ করে অন্যবিধ বৃত্তি অবলম্বন করতে উদ্যত হলে

তাদের অপরিসীম দুঃখের শিকার হতে হয়েছে। পুলিশের অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রথমবিধিই। তাই সাধুকে দিয়ে পুলিশের দারোগা অম্লান বদনে অশ্বশাবক বহন করিয়ে নিয়েছেন, বেচারী সাধুর অলৌকিক ক্ষমতা-ও সেখানে পরাস্ত হয়েছে। 'উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গল্পটিতে বুধোকে দিয়ে কৌশলে উদোর মাতৃদায় বহন করানো হয়েছে। আসলে এই কৌশলে গ্রামের নিরক্ষর, নিঃস্ব মানুষগুলি কত জমিদার মহাজনের প্রলোভনেরই না শিকার হয়েছে তারই ছায়াপাত ঘটেছে এখানে।

'আঁখের জল কুকসীমায় মারে'-র আপাত অর্থ যাই হোক, প্রকৃত পক্ষে গ্রাম বাংলার দুঃস্থ মানুষদের কল্যাণের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ বণ্টনের দায়িত্বে রত ব্যক্তিরা কিভাবে তা আত্মসাৎ করে নেয়, তারই ইঙ্গিতটি এখানে ধরা পড়েছে। কিংবা বর্ধমান অঞ্চলে যে একসময়ে ডাকাতদের খুব উপদ্রব ছিল আর হত্যাকারীর হত্যাকার্যকে 'কাতলা ফেলা' এই সাংকেতিক ভাষায় অভিহিত করত তাও জানা যায়।

জমিদারদের মোসাহেবদের অর্থহীন ইচ্ছা পূরণের যে বিচিত্র দৃষ্টান্ত 'কাঙালী মেরে কাছারী গরমে' পাই, তা থেকেই অনুমিত হয় এরকম ইচ্ছাপূরণের শিকার কত দুঃস্থ অসহায় ব্যক্তিকেই আগেকার দিনে হতে হয়েছে।

শুধু সমসাময়িক সমাজজীবনের প্রতিফলনের জন্যই নয়, সেইসঙ্গে নানা ঐতিহাসিক উপাদানেরও আকর হয়ে উঠেছে গল্পগুলি। রাজশাহীর দীননাথ সিংহ নামে দয়ালু মোক্তার, রাজনগরের যুবরাজ আলিনকী খাঁ, পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যতম সভাসদ কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী এঁরা সব ঐতিহাসিক চরিত্র। এঁদের নিয়ে রচিত গল্পগুলিতে অতিশয়োক্তি থাকতে পারে, কিন্তু কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য যে এগুলিতে স্থান পেয়েছে, সচেতন পাঠক তা অনুমান করতে পারবেন।

গল্পগুলিতে বর্ণিত চরিত্রগুলির অধিকাংশই আমাদের পরিচিত। লক্ষণীয়, আধ্যাত্মিক অথবা পৌরাণিক চরিত্রের তুলনায় সাধারণ পরিচিত মানুষরাই গল্পগুলিতে গুরুত্ব লাভ করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই চরিত্র-

গুলি বিশ্লেষণাত্মক হয়ে উঠেছে। প্রায় প্রতিটি গল্পেই একটি নীতি, উপদেশ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই উপদেশটি সোচ্চার হয়ে ওঠেনি। অন্ততঃ গল্পরস প্রচারধর্মিতার কারণে ব্যাহত হয় নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই প্রবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক কাহিনী প্রচলিত আছে। গ্রন্থে সেরকম কাহিনীও সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

গ্রন্থটি রচনায় বর্তমান লেখককে নানা জনেই উৎসাহিত করেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় আচার্য ডক্টর সুকুমার সেনের নাম। গ্রন্থটির নামকরণও আচার্যদেব কৃত। 'প্রবাদের গল্প' অথবা 'প্রকৃষ্ট গল্প' উভয় অর্থেই নামকরণটি গৃহীত হতে পারে। এছাড়াও ড. পল্লব সেনগুপ্ত, ড দুলাল চৌধুরী, ড. শান্তিময় ঘোষাল, অরূপ মুখোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় লেখকের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। গ্রন্থটি প্রকাশ করে প্রকাশিকা শ্রীমতী আরতি জানা লেখকের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

বাংলা বিভাগ
॥ নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ ॥

বরুণকুমার চক্রবর্তী

অত কথা বলতে পারব না রে বাবা ঃ

এক বৃদ্ধার মৃত্যু সময় উপস্থিত হলে তার পুত্রেরা তাকে মৃত্যুকালে দেবতা স্মরণ করাবার জন্য 'হরিবোল' বলতে অনুরোধ করে। কিন্তু বৃদ্ধার তখন বাক্‌শক্তি রহিত, তাই সন্তানদের সম্বোধন করে সে বলেছিল, 'অত কথা বলতে পারব না রে বাবা।'

অর্দ্ধজরতী অর্দ্ধ যুবতী ঃ

এক অত্যন্ত উদারচেতা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি দুর্ভিক্ষের সময়ে অন্নাভাবে নিজ পরিবার পরিজন পালনে অসমর্থ হ'য়ে নিজের গাভীটিকে হাটে নিয়ে গেলেন বিক্রয়ের জন্য। ক্রেতারা গাভীটির বয়স জিজ্ঞাসা করলে ব্রাহ্মণ বললেন বেশ বয়স হয়েছে তার। কারণ তিনি বিবেচনা করে দেখলেন যে সমাজে প্রাচীন লোকের কদর অধিক। তাই তাঁর ধারণা হল গাভীটিকে বয়স্কা বললে তিনি সঠিক মূল্য পাবেন। কিন্তু ফল হল বিপরীত। বেশি বয়সের শুনে হাটুরিয়ারা সব গরু না কিনেই চলে গেল। অগত্যা ব্রাহ্মণ এক হাট থেকে অন্য হাটে গরুটি বিক্রয়ের জন্য নিয়ে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু বিক্রয় আর হয় না। শেষে এক হাটুরিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন কেন তার গাভীটি হাটে বিক্রয় হচ্ছে না। হাটুরিয়া ব্রাহ্মণকে পরামর্শ দিলেন গাভীটিকে যেন এক বিয়ানের বলে ক্রেতাদের বলেন। কারণ কেউই বেশী বয়সের গাভী কিনতে প্রস্তুত নয়। ব্রাহ্মণ পড়লেন বিপদে। কারণ এ পর্যন্ত তিনি গাভীটিকে প্রবীণা বলে এসেছেন এখন তরুণী বললে লোকে কি বলবে? শেষে ভাবলেন শাস্ত্রে আত্মাকে পুরাণ পুরুষ বলা হয়েছে। বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য এসব দেহ ধর্মের প্রকারভেদ মাত্র। লৌকিক ব্যবহারে এসবের প্রয়োজন। তাই তিনি ভাবলেন গাভীটি আত্মাংশে জরতী শরীরাংশে তরুণী হতে পারে। সেইমত গাভীটি সম্পর্কে তিনি বললে এক ক্রেতা গাভীটি কিনে নিয়ে গেল।

অন্যের প্রতি দীননাথ অভাগার কপালে সিংহ :

রাজশাহীতে এক মহানুভব মোক্তার ছিলেন তাঁর নাম দীননাথ সিংহ। তাঁর দয়া দেশ প্রসিদ্ধ, তিনি নানা জনের উপকার করেছিলেন। নিরন্ন ব্যক্তি তাঁর কাছে পেত অন্ন, আশ্রয়হীন ব্যক্তি তাঁর কাছে পেত আশ্রয়, চাকুরীহীন বেকার ব্যক্তি লাভ করত চাকরী। এইভাবে অসংখ্য মানুষ মোক্তারটির কাছে উপকৃত হয়েছে। একদিন এক উমেদার নিতান্ত অসময়ে তাঁর কাছে চাকরীর জন্যে ধরলে তিনি স্পষ্ট বলে দেন, 'আমা হতে আর কিছু হবে টবে না।' মোক্তারটির মেজাজ তখন খুব খারাপ ছিল সম্ভবত। বেচারী উমেদারটির সেটা জানা ছিল না। উমেদারটি এমন জবাব আশা করেনি। সে দুঃখিত হ'য়ে করজোড়ে মোক্তারটিকে বললে, 'হুজুর সকলের বেলায় দীননাথ, আর অভাগার কপালেই সিংহ।'

অতি লোভে তাঁতী ডুবে :

কোন এক গ্রামে শ' দেড়েক তাঁতী বাস করত। তাঁতীরা ছিল অতিরিক্ত মাত্রায় অলস প্রকৃতির। সারাদিন কেবল খাওয়া দাওয়া আর গাল-গল্পেই তাদের সময় কেটে যেত। কেউ কোন কাজের ব্যাপারে ছিল না। তাঁতীদের মোড়ল দেখলে এ যে ভয়ানক ব্যাপার হচ্ছে। কাজ না করলে চলবে কি করে? তাই একদিন সমস্ত তাঁতীদের ডেকে মোড়ল বললে কিছুনা কিছু কাজ সকলকেই করতে হবে, নইলে তাদের পরিণতি খুবই খারাপ। একজন তাঁতী জানতে চাইলে, কি কাজ তারা করবে? সত্যই, সকলেরই একই প্রশ্ন, কি কাজ তারা করবে? অন্য এক তাঁতী বললে, কাজ হওয়া চাই এমন, যাতে খাটুনি কম কিন্তু লাভ অনেক। সকলেই ভাবতে লাগল, সেরকম কি কাজ আছে।

হঠাৎ মোড়ল চীৎকার করে উঠল, পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, তেমন কাজেরই সন্ধান মিলেছে। কাজটা কি? না তিল চাষ। তাঁতীরা

সকলেই মোড়লের জয়ধ্বনি করে উঠল। বাস্তবিক তিল চাষের ভারী সুবিধা। কেবল বীজ ছড়িয়ে দিলেই হ'ল, আপনা আপনি তিল চারা বেরিয়ে ক্রমে তাতে তিল ধরবে।

অতএব শুরু হল তিল চাষ। ধীরে ধীরে তিল গাছগুলি বড় হতে থাকল। ক্রমে ফসল ওঠার সময় এগিয়ে আসতে লাগল। তাঁতীরা তো মহাখুশী। রোজ সকাল-সন্ধ্যে তারা তিল বাড়ীতে যেতে লাগল হাওয়া খেতে।

একদিন সকালে রেংঘু তাঁতী আবিষ্কার করল তিল বাড়ীর অনেকটা অংশ কেউ যেন খেয়ে ফেলেছে। রেংঘু তাড়াতাড়ি মোড়লকে খবর দিল। মোড়ল তিল বাড়ী দেখে ঠিক বুঝতে পারলে না। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর সে তার ধারণার কথা ব্যক্ত করে বললে যে, সম্ভবত তাদের গৃহের গুঁড়ি ঝাড়া চালুনি গুলোরই এই কাজ। মোড়ল পরামর্শ দিল যে যার ঘরের চালুনি গুলি যেন খাটের খুরে বেঁধে রাখে। এভাবে রাখার পরও কিন্তু দেখা গেল তিল বাড়ী আক্রান্ত। তখন ঠিক হল, রাত্রে তিল বাড়ীতে পাহারা বসবে। প্রথম দিনই দায়িত্ব পড়ল রেংঘুর।

মাঝরাত। রেংঘু তিল ঝোপের মধ্যে একা বসে। সবে একটু তন্দ্রার ভাব এসেছে কি আসেনি, হঠাৎ সে চমকে উঠল। আকাশে কিসের একটা শব্দ। তাকিয়ে দেখে স্বর্গ থেকে ঐরাবত হাতী স্বয়ং তিল বাড়ীতে উপস্থিত হ'য়ে মনের সুখে তিল খেতে শুরু করেছে। রেংঘু মনে মনে তার কর্তব্য স্থির করে ফেলে। ঠিক করে হাতীর লেজ তিল গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখবে। সেইমত যেই সে ঐরাবতের লেজটি ধরেছে, অমনি ঐরাবত তিলবাড়ী ছেড়ে স্বর্গের উদ্দেশে যাত্রা করলে। ঐরাবতের লেজ ধরে ক্রমে রেংঘু স্বর্গে পৌঁছে গেল।

পরদিন রেংঘুকে না দেখতে পেয়ে তাঁতীরা ত সবাই বিমূঢ়। শেষ-পর্যন্ত অবশ্য রেংঘু পরদিন স্বর্গ থেকে ফিরে এল। তাঁতীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। সকলেরই জিজ্ঞাসা, রেংঘু কোথায় গিয়েছিল। রেংঘু তার স্বর্গে যাওয়ার কথা জানাল। বৃদ্ধ মোড়ল জানতে চাইল, স্বর্গে

রেংঘু দুই ঢোক গিলে জবাব দিলে, নাড়ু। সে আরও বললে স্বর্গে নাড়ু পাওয়া যায় পয়সায় আটগণ্ডা, দশগণ্ডা। মোড়ল ত বেজায় খুশী। হুকুম করলে সেদিন রাতে সকলেই স্বর্গে যাবে নাড়ু কিনতে। সকলকে সে পরামর্শ দিল সঙ্গে করে ভালমত পয়সা-কড়ি নিতে।

দিনের আলো নিভে আসতেই দেড়শ' তাঁতী তিল ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রইল। যথা সময়ে ঐরাবত তিল খেতে হাজির হবার সঙ্গে সঙ্গে রেংঘু তার লেজটি পাকড়ালে। হাতী উড়ে চলল স্বর্গে। না, আজ আর রেংঘু একলা নয়, তাকে ধরে রয়েছে বৃদ্ধ মোড়লসহ অন্য সব তাঁতী।

স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছেই মোড়ল জানতে চাইল নাড়ু কত বড় ? রেংঘু বললে স্বর্গে পৌঁছে নিজেরাই তা দেখতে পাবে। মোড়লের খুব অপমান বোধ হল। সে বললে একবার স্বর্গে গিয়েই রেংঘু ধরাকে সরা দেখতে শিখেছে। আবারও মোড়ল জানতে চাইল সে নাড়ুর কথা বলবে কি না। ক্ষুব্ধ রেংঘু তখন দু'হাত প্রসারিত করে দেখাতে গেল। ব্যাস্, সে এবং অন্য তাঁতীরা সকলে হাতীর লেজ থেকে অগাধ সমুদ্রে পড়ে গেল।

অতি লোভে তাঁতী নষ্ট :

এক রাজার একটি গাভী ছিল। একদিন দুধ দুইবার সময় গাভীটি খুব জ্বালাতন করল। রাজা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন পরদিন সকালে উঠে যাকে দেখতে পাবেন তাকেই গাভীটি দিয়ে দেবেন। পথ দিয়ে সেই সময় যাচ্ছিল এক তাঁতী। সে রাজার কথা শুনে মনে মনে ঠিক করল পরদিন সকালে সেই প্রথমে রাজার সামনে হাজির হবে, তাহলেই গাভীটি মিলবে।

বাড়ী ফিরে সে ভাবলে গাভীটি আনতে গেলে তাঁকে বাঁধবার জন্য দড়ির প্রয়োজন। তাঁতীর বাড়ীতে কাপড় বোনার সুতো ছিল। সব সুতো দিয়ে সে মোটা দড়ি তৈরী করল। এরপর ভাবলে গরু বাড়ীতে এসে দুধ দিচ্ছে দেখলে তার বুড়ী মা দুধ খেতে চাইতে পারে। তাই

সে পথ বন্ধ করার জন্যে তাঁতী তার বুড়ীমার চোখ দুটো নষ্ট করে দিল।

পরদিন সকালে ভোর ভোর উঠে তাঁতী রাজ প্রাসাদের সামনে এসে হাজির হল। রাজার সঙ্গে দেখা হতে রাজা তাঁতীর উপস্থিতির কারণ জানতে চাইলেন। তাঁতী গাভী লাভের কথা বলতেই ক্ষুব্ধ হয়ে রাজা দারোয়ান দিয়ে তাঁতীকে মেরে তাড়িয়ে দিলেন। তাঁতীর কপালে গাভীও জুটল না, উল্টে তার সুযোগগুলি সব নষ্ট হল।

অন্ধ গোলাঙ্গুল ন্যায়ের পরিচয় ঃ

এক অন্ধ ব্যক্তি শ্বশুরালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করে। ব্যক্তিটি মাঠের মধ্যে এক গোয়ালাকে অনুরোধ করল সে যেন তাকে তার শ্বশুরালয়ে পৌঁছে দেয়, কারণ সে চোখে দেখে না।

গোয়ালা (গোপালকে) বললে সে অনেকের গরু চরায়। অতএব অন্ধকে তার শ্বশুরালয়ে পৌঁছে দিতে গেলে গরু চরান হবে না। তাই তার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। সে এরপর অন্ধকে এক পরামর্শ দিল। বললে অন্ধের শ্বশুরের যে গরুটি খুব শান্ত স্বভাবের, সে যেন তার লেজ ধরে শ্বশুর বাড়ী চলে যায়। সেইমত অন্ধটি দৃঢ়ভাবে গরুর লেজ ধরলে সে বারবার অন্ধকে পদাঘাত করে। কিন্তু অন্ধ তবুও লেজ ছাড়ে না। মাটিতে ঘষড়াতে ঘষড়াতে গরুর লেজ ধরে সে ভগ্নাঙ্গ ও নগ্ন হয়ে গভীর রাত্রে গ্রামে পৌঁছালে অন্ধের শ্বশুরালয়ের ভৃত্যেরা অন্ধের অবস্থা দেখে দ্রুত তাকে গাভীটির হাত থেকে রক্ষা করে নিয়ে যায়।

অপরম্মা কিং ভবিষ্যতিঃ ঃ

এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণটি ছিলেন কাকচরিত্র বিদ্যায় পারদর্শী। একদিন তিনি সকালবেলা এক শ্মশানের কাছ দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেলেন পথের ধারে একটা মড়ার মাথা পড়ে রয়েছে। কাকচরিত্র বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি থাকায় তিনি মড়ার মাথা থেকে পড়লেন—

ভোজনং যত্র তত্রৈব
শয়নং হট্ট মন্দিরে,
মরণং গোমতী তীরে
অপরস্বা কিং ভবিষ্যতি।

ব্রাহ্মণ দেখলেন যার মুণ্ড, তার বরাত বেশ ভালই ছিল। কি রকম? সে খেত যেখানে সেখানে, থাকত হাটের মধ্যে একটা কুঁড়েতে, মৃত্যু হয়েছে তার গোমতী তীরে। কিন্তু ব্রাহ্মণের বড় কৌতূহল হল এরপর তার কি হবে তা জানার।

ব্রাহ্মণ মুণ্ডটা তুলে গামছায় বাঁধলেন এবং একটা নতুন হাঁড়ি কিনে তাতে সেটিকে রেখে বাড়ী এলেন। বাড়ীতে একটা জায়গায় হাঁড়িটা টাঙিয়ে রাখলেন মুণ্ডুর পরবর্তী অবস্থা কি হয় তা জানার জন্যে।

ব্রাহ্মণ প্রতিদিন একবার করে হাঁড়ি খুলে দেখেন মুণ্ডটির কিছু পরিবর্তন হল কি না। কিন্তু কিছুই দেখতে পেতেন না। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণের শিষ্য বাড়ী যাওয়ার দরকার হল। ব্রাহ্মণীকে ব্রাহ্মণ ভয় দেখিয়ে গেলেন যে হাঁড়িতে যেন হাত দেওয়া না হয়, কারণ ওতে একটা ভয়ঙ্কর সাপ আছে।

একদিন শাশুড়ীর সঙ্গে ব্রাহ্মণীর খুব ঝগড়া হল। ব্রাহ্মণী মনের দুঃখে আত্মঘাতী হতে চাইলেন। ভাবলেন হাঁড়িতে যে সাপ আছে তার দংশনেই মৃত্যু বরণ করবেন। কিন্তু হাঁড়ি খুলে একটা মড়ার মাথা দেখে ব্রাহ্মণীর ত চক্ষুস্থির। কিছুতেই তার মাথায় আসে না এত যত্ন করে ব্রাহ্মণ একটা মড়ার মাথা রেখেছেন কেন। শেষে অনেক ভাবনা চিন্তার পর তাঁর মনে হল এটি নিশ্চয়ই কোন মহিলার মাথা। ব্রাহ্মণের সঙ্গে মহিলাটির প্রণয় ছিল। তার মৃত্যুর পরেও তার মুণ্ডটি ব্রাহ্মণ ত্যাগ করতে পারেন নি। স্মৃতি রক্ষার্থে হাঁড়িতে ভরে রেখেছেন। এইবার শুরু হল ব্রাহ্মণীর প্রতিশোধ গ্রহণ।

ঢেঁকিতে মড়ার মাথাটি ফেলে প্রথমে চূর্ণ করলেন। তারপর—সেই চূর্ণ দুর্গন্ধময় নর্দমায় ফেলে দিলেন।

ব্রাহ্মণ শিষ্য বাড়ী থেকে ফিরে এলে ব্রাহ্মণী তাঁকে নর্দমার কাছে

টেনে এনে মুণ্ডের পরিণতির কথা জানালেন। ব্রাহ্মণের সব শুনে তো চক্ষুস্থির হবার যোগাড়।

আপনি রইলেন ডর পানিতে পোলারে পাঠালেন চর।

এক পূর্ববঙ্গবাসী এসে উপস্থিত হল পশ্চিমবঙ্গে। এখানে সে স্নান করবে বলে একটা পুকুরের ঘাটে নামে। পুকুরের ঘাটের জলে সেই সময় কয়েকটা গাঙদাড়া ভাসছিল। গাঙদাড়া হল এক ধরণের মাছ। কিন্তু পূর্ববঙ্গবাসীটি এগুলিকে বুঝতে না পেরে ভাবলে বুঝিবা কুমীরের বাচ্চা। সে তখন চিন্তা করলে কুমীর নিজে গভীর জলে থেকে ছেলেদের চর হিসাবে পাঠিয়েছে পুকুরঘাটে কোন শিকার এসেছে কিনা তা জানতে। অতএব ছেলেরা খবর দেওয়ামাত্র কুমীর এসে তাকে ধরে নিয়ে যাবে। এই ভয়ে তৎক্ষণাৎ সে পুকুরঘাট ত্যাগ করে গেল। তার আর স্নান করা হল না।

আমি ও ফকির হলেম, দেশেও অকাল এল ঃ

এক ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। তখন সে অগত্যা ফকিরী করে জীবিকা নির্বাহ করবে বলে স্থির করল। কিন্তু তার এমনই কপাল যে ফকিরী গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই দেশে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। মানুষের নিজেদেরই ভরণ পোষণ হয় না তা ফকিরকে আর কে ভিক্ষা দেবে। অতএব বেচারীর ফকিরী নেওয়া ব্যর্থ হল। তার আর ভিক্ষালাভের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হল না।

আলিনকী বাহাদুর পাগড়ী সে বাঁধে তলোয়ার, এক ঘরি মে লুঠ লিয়া কলকেত্তা বাজার ঃ

রাজনগরের যুবরাজ ছিলেন আলিনকী খাঁ। ইনি কিছুদিনের জন্য

নবাব সিরাজদ্দৌলার অধীনে চাকরী করেছিলেন। সিরাজ যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে কলকাতায় যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন সেনাপতি আলিনকীও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। হৃত গৌরব রাজনগরের—বীরভূমের ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজধানী লক্ষ্ণৌয়ের মুসলমানরা এখনও নাকি একখণ্ড জীর্ণ বস্ত্র 'লুটের কাপড়' বলে অভিহিত করে থাকেন। বস্ত্রখণ্ডটি প্রতি বছর—মহরমের সময় তাজিয়ায় বেঁধে সকলে অতীত স্মৃতির তর্পণ করেন।

আর গাব খাব না, গাব তলা দিয়ে যাব না।
গাব খাব না ত খাব কি, গাবের মত আছে কি ?

গাব ফল খেতে গিয়ে একটি কাকের গলায় গাবের আঁটি বেঁধে গিয়েছিল ; যন্ত্রণায় কাতর কাকটি সেই সময় প্রতিজ্ঞা করে যে, জীবনে সে আর গাব ফল খাবে না। কিছুক্ষণ পরে গাবের আঁটি গলা থেকে নেমে গেলে স্বভাবতঃই কাকের যন্ত্রণার অবসান ঘটল। তখন সে বললে যে গাবের তুল্য আর কি আছে, সুতরাং অবশ্যই সে গাবফল ভক্ষণ করবে।

আঁখের জল কুকসীমায় (ককৃসীমায়) মারে ঃ

উত্তর বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটী ও বড়জোড়ায় দীর্ঘদিন ধরে এই প্রবাদটি চলে আসছে। এই এলাকা আখ চাষের জন্য বিখ্যাত। এখানকার আখের গুড় বেশ উচ্চমানের। যে জমিতে আখ চাষ হয় তাকে বলে 'আঁখ বাড়ী'। সাধারণতঃ আঁখ বাড়ীতে আখ গাছ বড় হবার পর তিন থেকে চার বারের মত জল সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। চারা যখন ছোট অবস্থায় থাকে, তখন দু' তিনদিন অন্তর সেচ দিতে হয়। ক্রমে চারাগুলি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। আখ গাছের বয়স যখন ৮ থেকে ৯ মাস তখন গাছের গোড়ার মাটিতে আর রস থাকে না। ফলে তখন

সেচ দেওয়া খুব জরুরী হয়ে পড়ে। এই সময়ে 'আঁখ বাড়ী' তে কুকসীমা বা ককসীমা নামে একধরণের গুল্ম জাতীয় চারা গাছ আখ গাছের পাশে পাশে জন্মে। ফলে আখ গাছে সেচ দেওয়া হলে সেই সেচের জল কুকসীমা বা ককসীমাও পায়। এই জল পাওয়াকে উত্তর বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটী ও বড়জোড়া থানার কৃষিজীবীরা বলে 'আঁখের জল কুকসীমায় মারে।'

ঈশ্বর যা করেন তা সবই মঙ্গলের জন্য ঃ

এক রাজার একটি আঙ্গুল কেটে গেলে তিনি এজন্য খুব কাতর হন। মন্ত্রী তখন রাজাকে সান্ত্বনা দানের জন্য বলে, 'ঈশ্বর যা করেন তা সবই মঙ্গলের জন্য।'

রাজা মন্ত্রীর এই কথা শুনে খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁর আঙ্গুল কাটা যাওয়ায় ঈশ্বর যে কি ভাল করলেন তা তাঁর বোধগম্য হল না। যাই হোক তিনি মন্ত্রীর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য মনে মনে স্থির করলেন। একদিন রাজা শিকারের উদ্দেশ্যে বনে গেছেন সঙ্গে গেছে মন্ত্রী। কৌশলে রাজা মন্ত্রীকে একটি জলশূন্য কূপে ফেলে দিলেন। এদিকে নিজে সৈন্য সামন্ত এবং অন্যান্য লোকজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন শিকারের সন্ধানে ফিরে। এই অবস্থায় তিনি পড়লেন ডাকাত দলের হাতে। ডাকাতেরা রাজাকে কালী ঠাকুরের কাছে বলি দিতে মনস্থ করল। বলিদানের ব্যবস্থা সব সম্পন্ন, হঠাৎ ডাকাতদের নজরে পড়ল রাজার একটি আঙ্গুল কাটা। সঙ্গে সঙ্গে তারা রাজাকে ছেড়ে দিল। কেননা খুঁত যুক্ত মানুষকে বলি দান করা যায় না।

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে রাজা বুঝলেন মন্ত্রী ঠিকই বলেছিল, ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই। এরপর রাজা অনুতপ্ত হয়ে এসে কূপ থেকে নিজেই মন্ত্রীকে উদ্ধার করলেন এবং নিজের জীবন রক্ষার কাহিনীটি বললেন। মন্ত্রীও জানাল রাজা তাকে কূপে নিক্ষেপ করে ভালই করেছিলেন নতুবা রাজার পরিবর্তে তাকেই

ডাকাতদের হাতে প্রাণ দিতে হত। কেননা রাজার আঙ্গুল কাটা থাকলেও তার কোন খুঁত ছিল না।

উল্টা বুঝলি রাম ঃ

এক ছিল সাধু। সে একদিন পথশ্রান্ত হ'য়ে ভগবানের উদ্দেশে একটা লাভের আরজি জানাল। ভাবলে ঘোড়া পেলে তার ওপর চড়ে দিব্বি যেতে পারবে। পথশ্রমে আর ক্লিষ্ট হতে হবে না।

হঠাৎ সেখানে এক পুলিশের দারোগা এসে উপস্থিত হল। দারোগাটি ছিল অশ্বারূঢ়। তার অশ্বটি ছিল মাদী, সঙ্গে ঘোটকীর শাবকটিও ছিল। শাবকটি চলতে অশক্ত হওয়ায় ঘোটকীওটি কিছুতেই অগ্রসর হতে চাইছিল না। এমন কি চাবুকের দ্বারা প্রহৃত হওয়া সত্ত্বেও ঘোটকী নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। এই কারণে দারোগাটি একজন বাহকের সন্ধান করছিল। এমন সময়ে সামনে সাধুকে পেয়ে দারোগা তাকেই নির্দেশ করলে ঘোটকীর শাবকটিকে কাঁধে নিয়ে তাকে অনুসরণ করতে। দারোগার উগ্রমূর্তিতে সাধুর অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়া হবার দাখিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই শাবকটিকে কাঁধে নিয়ে দারোগার অনুগমন করতে থাকল সে। আর মনে মনে বললে, 'উল্টা বুঝলি রাম।'

উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে ঃ

এক পল্লীতে উদয়চাঁদ নামে এক চাষী কৈবর্ত আর বুধুইচাঁদ নামে এক সদ্‌গোপ বাস করত।

একদিন উদয় বা উদো পল্লীর 'চাঁই' বলাইচাঁদের কাছে উপস্থিত হয়ে বললে তার বড় বিপদ, মাতৃদায় উপস্থিত। অথচ তার হাতে একটিও পয়সা নেই। কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। সে বলাইয়ের সাহায্য প্রার্থনা করলে।

উদো ভেবেছিল, বলাই নিজেই হয়ত তাকে কিছু আর্থিক সাহায্য দেবে। বলাই বললে উদো এপর্যন্ত কেবল অন্যের বাড়ী গিয়ে খেয়ে এসেছে। এখন মাতৃশ্রাদ্ধে তারও কর্তব্য পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করা। তাছাড়া সন্তান হিসাবে মায়ের শেষ কাজটুকুত তার ঠিকমত করা চাই। সে বললে যে তার হাতে কোন টাকা নেই। তবে সেজন্যে উদোর চিন্তারও কোন কারণ নেই।

পরদিন উদো এবং তার বন্ধু বুধুই বা বুধো যে জমিতে চাষ-বাস করছিল, সেখানে বলাই গিয়ে হাজির। বুধোর কিছু পয়সা কড়ি ছিল। বলাই সেটা জানত। তার সঙ্গে উদোর ভাবও ছিল বেশ। বলাই উদোকে বললে, উদো, আর কতদূর? উদো উত্তর দিল, তার বেশ দেরী আছে। সে বললে একে তার মাতৃদায় নিজে খাটতে পারে না তেমন। তার ওপর পয়সা খরচেরও সামর্থ্য নেই। লেখা পড়াও জানে না যে চাকরী বাকরী করে হু'পয়সা উপার্জন করবে। খেটেই তাকে খেতে হবে, কি আর করে।

বলাই অমনি বললে তা লেখাপড়া তো বুধুইও জানে না। বুধো কিছু বলার আগে উদো বলে উঠল, না বুধুইও জানে না। আর যায় কোথা। রাগে গরগর করতে করতে বুধো বললে, কেন জানে না! কাগজ কলম থাকলে সে লিখে দেখিয়ে দিত জানে কি না। আসলে বুধো তার নামটা লিখতে জানত। তাতেই তার গর্ব। সঙ্গে সঙ্গে বলাই উদোকে কাগজ কলম আনতে বললে—বুধোর কথা ঠিক কিনা পরীক্ষা করে দেখবে। কাগজ কলম আনা হলে বুধো বলাইয়ের নির্দেশমত এক জায়গায় সই করলে। ব্যাস্, বলাই কাগজটা নিয়ে চলে গেল অবশ্য বুধোকে ধন্যবাদ দিতে সে ভোলে নি। আসলে বুধোর কাছ থেকে কৌশলে বলাই লিখিয়ে নিল উদোর মাতৃশ্রাদ্ধের যাবতীয় খরচ সেই বহন করবে। উদো তার মাতৃশ্রাদ্ধ শেষ করল আর সেই বাবদ সমস্ত খরচ বুধোকে মেটাতে হল। লোকে এই থেকে বলাইকে দেখে বলত—

কিবা কাল কিবা কর্ম
ধনী হয়ে এই কর্ম

কারো গলে দিয়ে ছুরি,
কারে বা ক্ষীরের খুরী।
এতে কী পুণ্য হইবে;
যম যে দণ্ড করিবে!
হাতীর বোঝা দিলে ষাঁড়ে,
উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে।

এই লেলানই লেলান :

একজন মাতাল পথ দিয়ে মাতলামি করতে করতে যাচ্ছিল। কয়েকটি ছেলে একটু মজা করার জন্যে মাতালটিকে লক্ষ্য করে একটি কুকুর লেলিয়ে দিল। মাতাল ভয় পেয়ে একটু তফাতে গিয়ে বিকৃত স্বরে বললে, 'দেখ বাবা, আমার বংশাবলীর মধ্যে কখনও যদি কাউকে কুকুরে কামড়ায়, তবে তার জন্যে দায়ী হবে তোমরা। এই লেলানই লেলান।

ভায়ারও ফলার :

এক গুলিখোর পেটুক ব্রাহ্মণ আকণ্ঠ ফলাহার করে জয়ঢাকের মত ভুঁড়ি নিয়ে পথ চলছিল আর ভাবছিল, হায়রে কেউ যদি তাকে কাঁধে করে নিয়ে যায়। এমন সময়ে সে দেখতে পেল দুটো লোক বাঁশে বেঁধে একটি মরা গরুকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। মরা গরুর পেট ফুলে ওঠে। ব্রাহ্মণ গরুর ফোলাপেট দেখে মন্তব্য করলে, 'ভায়ারও ফলার।'

ঐ সরকারের রীতিই এই :

একটা বেঁজিকে একবার এক সিংহ তাড়া করে। বেঁজিটা প্রাণ-ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা গর্তে ঢুকে পড়ল। ঢোকামাত্র তার ত

চক্ষুস্থির। দেখে সেটি শিয়ালের গর্ত। শেয়াল গর্তে বসে বিনা চেষ্টায় শিকার পেয়ে মহানন্দে বেঁজিটিকে যেই ধরে খেতে যাবে, উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে অমনি বেঁজিটি বলে উঠল, 'সে কি মামা চিনতে পারছ না, আমি যে তোমার ভাগ্নে, একটা সংবাদ দিতে তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি। পশুরাজের মন্ত্রীত্ব খালি হওয়ায় আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, মন্ত্রী হবে ত শীঘ্র চল।

মন্ত্রীত্বের প্রলোভনে শেয়াল মেতে উঠল। তবে নতুন কাজে যেতে হবে বলে সে একটু দিনক্ষণ দেখে নিতে চাইল। দেখলে সামনে 'যোগিনী'। সামনে যোগিনী দেখে শেয়াল তার যাওয়া অনুচিত বললে বেঁজি পরামর্শ দিল, 'মামা, এক কাজ কর। যোগিনীর পিছু পিছু চল।'

শেয়াল দেখলে পরামর্শটা মন্দ নয়। তখন সে পিছু হটে চলতে আরম্ভ করল। এখন গর্তের মুখে ছিল পশুরাজ—খপ্ করে সে শেয়ালের লেজটি চেপে ধরল। শেয়াল হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাগ্নে, এ টান ধরল কিসের?'

বেঁজি আসল ব্যাপারটি বুঝে জবাব দিলে, 'মামা, টানটা বুঝি নিকেশের।' শেয়াল বললে, 'কাজ না করতেই নিকেশ? বেঁজি হেসে জবাব দিল, 'মামা, 'ঐ সরকারের রীতিই এই।'

ঐ রোগেই তো ঘোড়া মরে ঃ

এক ব্যক্তি কোন লোকের কাছে একটি ঘোড়া গচ্ছিত রেখে স্থানান্তরে যায়। কিছুকাল পরে সে ঐ ব্যক্তিটির কাছে ফিরে আসে এবং তার গচ্ছিত ঘোড়াটি ফেরৎ চায়। তখন যার কাছে ঘোড়াটি গচ্ছিত ছিল, সে বললে প্রায় ছয় মাস ধরে সে ঘোড়াটিকে খাইয়েছে। আজ দিন দুই তিন হল ঘোড়াটির মৃত্যু হয়েছে। আসলে লোকটি ঘোড়াটি দিতে অনিচ্ছুক ছিল। যাই হোক যে ব্যক্তির ঘোড়া, সে তখন একথা বিশ্বাস না করে বললে তার ঘোড়াটি যদি মারা গিয়ে থাকে তবে সে তার মাথাটি দেখতে চায়।

এইকথা শুনে যে ঘোড়াটি নিজের কাছে রেখেছিল, সে একটি গরুর মাথা এনে ঘোড়াটির মালিককে দিল। মালিক দেখলে ঐ মাথাটিতে মাত্র এক সারি দাঁত রয়েছে। সে সঙ্গে সঙ্গে বললে, ঘোড়ার ত কখনও একপাটি দাঁত হয় না, ওটি নিশ্চয়ই গরুর মাথা। তখন ঘোড়াটির আত্মসাৎকারী বললে, 'ঐ রোগেই তো ঘোড়া মরে।' অর্থাৎ এক পাটি দাঁত পড়ে যাওয়ার ফলেই ঘোড়াটির মৃত্যু হয়েছে। কারো কারো মতে গরু গচ্ছিত করাকে কেন্দ্র করেই এই প্রবাদটির উৎপত্তি। সেক্ষেত্রে অবশ্য প্রবাদটি হবে, 'ঐ রোগেই তো গরু মরে।'

ওরে ফিরিয়ে আন্, শীঘ্র ফিরিয়ে আন্ ওস্তাদ সুর পাল্টেছে :

পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ ছিলেন অত্যন্ত সঙ্গীত প্রিয়। তাঁর রাজসভায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিভাবান সঙ্গীত শিল্পীদের আগমন ঘটত। এইরকম একবার এক খ্যাতনামা সানাইবাদক এলেন সানাই বাজাতে। প্রথম থেকেই রাজা লক্ষ্য করলেন ঐ সানাইবাদক রাজাকে তেমন সুনজরে দেখছেন না। ভাবখানা এমন যে গ্রামাঞ্চলের এক সাধারণ নরপতি মার্গ সঙ্গীতের আর কতটুকু বুঝবেন। রাজাও তাই ঐ শিল্পীর মনোভাব পরিবর্তনের জন্য এক বিচিত্র পরিকল্পনা করলেন।

তিনি কয়েকটি চালাক লোক সংগ্রহ করলেন। দেহাতীর বেশে তারা রশোনচৌকির এদিক ওদিক দিয়ে যাবার সময় ওস্তাদ বাজিয়েকে জানিয়ে দিয়ে যাবে তিনি কি রাগ বাজাচ্ছেন। আসলে রাজা নিজেই তাদের প্রত্যেককে শিখিয়ে দিচ্ছিলেন সানাইয়ে কি রাগ বাজছে। এইভাবে বেশ কয়েকজন ওস্তাদের কাছে হাজির হয়ে নির্দিষ্ট রাগের বাজনার প্রশংসা করে গেল। ওস্তাদজী ত অবাক। গ্রামের সাধারণ মানুষগুলোর সঙ্গীতে এমনতর অনুরাগ এবং জ্ঞান দেখে তিনি ত বিস্মিত। প্রত্যেকেই তাঁকে তারিফ করে যাচ্ছে তাঁর সুনির্দিষ্ট রাগে বাজানো সানাইয়ের জন্য।

একটু সন্দেহ দেখা দিল তাঁর। তিনিও বুঝলেন কোন কিছুর মতলব চলছে। একটু সজাগ হয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমঝদার শ্রোতারা রাজপ্রাসাদের কাছ থেকেই আসছে। বুঝলেন কেউ নিশ্চয়ই তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠাচ্ছে। ওস্তাদজী তখন একটা কৌশল করলেন। তিনি শুরু করলেন একটি বিশেষ রাগের বাজনা। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল রাজপ্রাসাদের কাছ থেকে একজন লোক সানাই মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটি কাছাকাছি আসা মাত্র সানাইবাদক পূর্বের রাগ পাল্টিয়ে আর একটি ভিন্নতর রাগ বাজাতে শুরু করলেন। রাজা নীলমণি সিংহ বুঝতে পারলেন ওস্তাদজী তাঁর চাতুর্য ধরে ফেলেছেন। তিনিও যাতে ধরা না পড়েন সেজন্য চীৎকার করে বলতে লাগলেন, 'ওরে ফিরিয়ে আন, শীঘ্র ফিরিয়ে আন ওস্তাদ সুর পাল্টেছে।'

কাতলা ফেলার দেশ ঃ

এটি একটি সাংকেতিক প্রবাদ। আগেকার দিনে বর্দ্ধমান অঞ্চলের পথিকদের এইখানকার লোকেরা হত্যা করে যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিত। হত্যাকারীরা হত্যাকারীকে গোপন রাখতে সাংকেতিক ভাষায় বলত, 'আমরা কাতলা ফেলতে যাই।'

কথা কইব যে দুয়ার দিব সে ঃ

কোন এক সময়ে ছিল এক বুড়ো আর বুড়ীর সংসার। একদিন সন্ধ্যাবেলা দমকা বাতাসে তাদের বন্ধ দরজাটি গেল খুলে। বুড়ো বা বুড়ী কেউই দরজা দিতে এগিয়ে এলো না। সুযোগ পেয়ে শেয়াল ঘরে ঢুকে ভাত তরকারী খেয়ে গেল। চোর বাড়ীতে ঢুকে যথাসর্বস্ব নিয়ে পালাল।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী উঠে অন্যের বাড়ী কাজ করতে চলে গেল। বুড়ো কোন কথা না বলে নিজের বাড়ীর সামনে চুপচাপ বসে রইল। এক নাপিত এসে বুড়োকে ডাকল। বুড়ো কিন্তু কোন কথা বলল না। নাপিত তখন রহস্য করে বুড়োর অর্ধেক মাথা আর অর্ধেক দাড়ি কামিয়ে তুলো লাগিয়ে চলে গেল। তবু বুড়ো নির্বাক রইল। দুপুর নাগাদ বুড়ী বাড়ী ফিরে বুড়োর অবস্থা দেখে হেসে বললে, বেশ হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো বুড়ীকে চেপে ধরলে, তাকেই বাড়ীর দরজা বন্ধ করতে হবে, কেননা সেই প্রথমে কথা বলেছে।

কাঠ পাথরে বিশেষ কি ?

কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ রহস্য নিপুণ রসসাগর বা কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীকে এই প্রবাদটির স্রষ্টিকর্তা রূপে বিবেচনা করা হয়। কথিত আছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একদা রসসাগরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কাঠ পাথরে বিশেষ কি ?'

রসসাগর তাঁর অদ্বিতীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বশে যে উত্তর দেন তা হ'ল এই রকম—

শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য যখন বনবাসী হন, তখন তাঁর পদরজে শাপগ্রস্তা পাষাণে পরিণতা অহল্যা উদ্ধার লাভ করেন। শ্রীরামচন্দ্রের পদরেণু স্পর্শে পাষাণী মানবীতে রূপান্তরিত হয়েছে জেনে অনেকেই বিস্মিত হলেন। দণ্ডকারণ্যের নদীতীরে এক নৌকার মাঝিও কথাটি শুনেছিল। তাই শ্রীরামচন্দ্র যখন তার নৌকায় নদী পার হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন বিস্ময় বিহ্বল মূঢ় নৌকার মাঝিটি কাতর স্বরে তাঁকে বলল :

'আমার চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো
পরের বাড়ী হবিষ্যি
আমার নাই লক্ষ্মী দীন দুঃখী,
কতকগুলি কুপুষ্যি

তোমার ঠেকলে পা, ঘুচবে না
লা (নৌকা) হয়ে যাবে মনিষ্যি
আমি ঘাটে থাকি, বুদ্ধি রাখি,
"কাঠ পাথরে বিশেষ কি ?"

প্রকৃত-পক্ষে উদ্ধৃত বক্তব্যটি একটি সংস্কৃত শ্লোকের প্রতিধ্বনি মাত্র। শ্লোকটি হ'ল এই রকম ঃ

"মানুষী করণ রেণু রস্তিতে পাদয়ো রিতি কথা প্রথীয়সী,
স্খালয়ামি তব পাদপঙ্কজে, নাথ দারুদৃষ দস্তকাভিদা।"

কে জানে তার লেখাজোখা
তিন চাঁড়ালের তিন টাকা।

তিন চাঁড়াল নদীতে মাছ ধরছিল। এমন সময়ে এক শঠ নদী পার হতে এসে তাদের দেখে কিছু আদায় করার মতলবে বললে যে তারা যেহেতু মাছ ধরছে তাই তাদের খাজনা দিতে হবে। চাঁড়াল তিনজন খুব ভয় পেয়ে জানতে চাইলে, কত খাজনা তাদের দিতে হবে। শঠ বললে তিন সিকে। এখন চাঁড়ালদের শিকেতে অর্থাৎ গেঁজেতে টাকা ছিল। তারা চিন্তা করলে যদি রাজস্ব আদায়কারী শিকে নিয়ে যায়, তবে ত সব টাকাই যাবে। তাই তারা তিনজনে তিনটি টাকা দিয়ে আর তার-পরে হাতে পায়ে ধরে সে যাত্রায় রেহাই পাবার কথা চিন্তা করলে। লাভে থেকে শঠ ব্যক্তির তিনটি সিকির পরিবর্তে তিনটি টাকা লাভ হয়ে গেল।

'কুল উদ্ধার করল গুঁজা পুতে'
'বুঝ্যা নিবে টান্যা নিতে'

এক ব্যক্তির পুত্রটি ছিল কুঁজো। সে যাই হোক, কুঁজো পুত্রটির সঙ্গে একটি সুস্থ স্বাভাবিক মেয়ের বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আনল। খুশী হয়ে সে

বললে, 'আমার কুঁজো ছেলে আমার কুল উদ্ধার করলে।' কথাটি কন্যার পিতার কাছে গেল। মেয়েটি যে অন্ধ ছিল তা পাত্রের পিতারা জানত না। তাই কন্যার পিতা বললে, 'টেনে নেবার সময় বুঝতে পারবে।'

কি বলবো মরে আছি :

এক মাতালকে মৃত মনে করে শববাহকেরা শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছিল সৎকারের উদ্দেশ্যে। তারা এদিকে শ্মশান ঘাট ঠিক জানত না। তাই পথচারীদের কাছে ঘাটে যাবার পথ দেখিয়ে দিতে অনুরোধ করল। ইতিমধ্যে মাতালটির জ্ঞান ফিরলে সে বলে ওঠে সেও দেখিয়ে দিতে পারত, কিন্তু কি আর করে সে যে মরে রয়েছে।

কত রবি জ্বলে রে, কেন আঁখি মেলে রে :

দুটি অলস ব্যক্তি একদিন একটি গৃহে নিদ্রা যাচ্ছিল। এমন সময়ে গৃহে আগুন লাগে। আগুনের তাপে জেগে উঠে প্রথম ব্যক্তিটি চোখ না খুলেই দ্বিতীয় জনের কাছে জানতে চাইলে, 'আজ আকাশে কটা সূর্য্য উঠেছে রে?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি চোখ না খুলেই জবাব দিলে, 'কে চোখ খুলে তা দেখে?'

কিবা বিয়ার বিয়া, আবার চিৎ বাজনা :

বিবাহোপলক্ষে এক ব্যক্তি ঢোল বাজাচ্ছিল। ঢোল বাজাতে বাজাতেই সে হঠাৎ পিছলিয়ে পড়ে গেল। লোকটি উপস্থিত জনতার কাছে যাতে হাস্যাস্পদ না হয়, সেজন্য চিৎ হয়ে পড়েও ঢোল বাজিয়েই চলল। তার সহবাদ্যকর তখন এই মন্তব্যটি করে।

কেঁচে গণ্ডুষ করা :

জনৈক ভক্ত গুরুদেবের প্রসাদ পাবার আশায় গুরুর ভোজনের সময় তাঁর কাছে বসেছিল। গুরুদেব যথারীতি গণ্ডুষ করে ভোজন পর্ব শুরু করলেন। তারপর ভোজনান্তে তিনি আচমনের জন্য যখন পুনরায় এক গণ্ডুষ জল নিলেন, তখন উপবিষ্ট ভক্তটি ভাবল গুরুদেব নিশ্চয়ই দ্বিতীয়বার গণ্ডুষ করে ভোজনে প্রবৃত্ত হতে চলেছেন। ভক্তটি খুবই নিরাশ হল। সে ভাবল তাহলে তার কপালে আর গুরুদেবের প্রসাদ জুটল না। কারণ ইতিমধ্যেই গুরুদেবের যৎসামান্য ভুক্তাবশেষ পড়ে ছিল।

কাঙালী মেরে কাছারী গরম :

এক জমিদারের কাছারীতে সবাই ম্রিয়মাণ হয়ে বসে রয়েছে। কারণ অজন্মার জন্যে তেমন খাজনা পত্তর কিছুই জমা পড়ছে না। ফলে টাকার অভাবে জমিদারের ইয়ার বক্সীদের আমোদ-আহ্লাদ, নাচ-গান, হৈ-হল্লা সবকিছু বন্ধ। অজন্মার কারণে দেশের মানুষ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন। সর্বত্র এক কথা,—হা অন্ন, হা অন্ন। অন্নের তাগিদে চাষী, গৃহস্থ সব বেরিয়েছে দলে দলে ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে। এমনি করে এক চাষী অবস্থার ফেরে ভিখারী হ'য়ে কাছারীতে এসে হাত পেতেছে দুটি চালের জন্যে। ভেবেছে জমিদার হল প্রজার মা-বাপ। বিপদের ত্রাণ-কর্তা। অতএব তিনি নিশ্চয়ই তাকে নিরাশ করবেন না। দুটি ভিক্ষে দেবেনই। এদিকে কাঙালীকে কাছারীর মধ্যে পেয়ে জমিদারের মো-সাহেবের দল তো আনন্দে ফেটে পড়ল। কিছুই করার ছিল না তাদের। তাই তারা কাঙালীকে নিয়ে মজা করবে বলে ঠিক করল। কি রকম মজা? না কাঙালীকে ঠেঙিয়ে তারা মজা লুটবে। বেচারী যত প্রহার খাবে, যন্ত্রণায় ছটফট করবে, ততই তাদের মজা হবে। সেইমত তারা হতভাগ্য কাঙালীকে ধরে ঠেঙিয়ে মজা করতে লাগল। শেষপর্যন্ত এক সময়ে বেচারী ছাড়া পেল। মারধোর খেয়ে বেচারী যখন ব্যর্থ

মনোরথ হয়ে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে, তখন সে রাগে গজগজ করতে করতে বলে গেল 'হারামজাদার পো'রা কাঙালী মেরে কাছারী গরম কচ্চেন।'

খ'য়ে বন্ধন :

একটি ছেলে ঘরে খুঁটির কাছে বসেছিল। তার ঠাকুরমা একটি পাত্র হাতে তার সামনে এসে বললে, খই খাবি ত হাত পাত। লুব্ধ বালক তার দুটি হাত একত্রে যুক্ত করে ধরল। কিন্তু ব্যগ্রতা বশতঃ সে খুঁটির দুই পাশ দিয়ে তার হাত দু'খানি বাড়িয়ে দিয়েছিল। ঠাকুরমা ছেলেটির হাতে খই ঢেলে দেওয়ার পর সে তার মুখের কাছে হাত সরিয়ে নিতে গিয়ে নিজের বিপদ বুঝতে পারল। হাত খুললে খই মাটিতে পড়ে যায়, হাত না খুললে খই মুখে দেওয়া যায় না, খুঁটিতে হাত আটকে থাকে।

খয়ের খাঁ :

'খয়ের খাঁ' কথাটিই অশুদ্ধ। কোন খাঁ সাহেবের সঙ্গে এই বাক্যাংশটির কোন সম্পর্ক নেই। বাক্যাংশটির প্রকৃত উচ্চারণ 'খায়ের শাহ"। ফারসী ভাষায় এটি একটি যৌগিক শব্দ। 'খায়ের' শব্দটির অর্থ হ'ল শুভ বা মঙ্গল। অপরপক্ষে 'শাহ' শব্দটির অর্থ হ'ল ইচ্ছা করা। অতএব 'খায়ের শাহ' বাক্যাংশটির অর্থ হল শুভেচ্ছু। মো-সাহেবরা সর্বদা প্রভুর শুভাকাঙ্ক্ষী বলে নিজেদের প্রকাশ করতে থাকে, তাই তারা খায়ের শাহ। পার্শী অনভিজ্ঞরা বাক্যাংশটির প্রকৃত অর্থ না বুঝে বর্তমান অর্থটি দাঁড় করিয়েছে। অর্থ না বোঝার জন্যে তারা 'খাহ' শব্দটিকে 'খাঁ' মনে করেছে এবং এর ফলেই 'খয়ের খাঁ' শব্দটি প্রচলিত হয়েছে।

খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে
কাল কল্লে এঁড়ে কিনে।

এক তাঁতী দিব্যি কাপড় তৈরী করে তা বেচে সংসার চালাচ্ছিল। একদিন হাটে কাপড় বেচে ফেরার পথে সস্তায় একটি এঁড়ে কিনে

বাড়ী ফিরল। এরপর সে তাঁত বোনা ছেড়ে চাষ করবে বলে মনস্থ করল। চাষের জন্য আর একটি বলদের দরকার। তাই সে তার তাঁত সুতো ইত্যাদি সব বেচে অপর একটি গরু কিনে চাষ শুরু করলে। কিন্তু চাষে তার লাভ ত হলই না, উল্টে দেনায় বিকিয়ে গেল।

গৌর হতে বাঁকী অনেকদিন :

প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের একটি গানের শেষ পদে আছে 'গৌর হতে বাঁকী অনেক দিন।'

এক লেখক তাঁর স্বরচিত একটি গ্রন্থকে পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত পুস্তকের তুল্য কিংবা তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলে প্রতিপাদনের চেষ্টা করায় কোন বিচক্ষণ রসিক ব্যক্তি উদ্ধৃতাংশটি বলেন। সেই থেকে এটি প্রবাদে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে রসিক ব্যক্তিটি বলতে চেয়েছেন যে বিদ্যাসাগরের সমান উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করা ঐ লেখকটির পক্ষে খুবই কঠিন কাজ।

গোঁফ খেঁজুরে :

একবার এক অসম্ভব রকমের আলসে লোক একটা খেঁজুর গাছের তলায় শুয়েছিল। এমন সময়ে একটা বুলবুল পাখী এসে ঐ খেঁজুর গাছটিতে বসল। সে পাকা খেঁজুরের ওপর তার ঠোঁট দিয়ে আঘাত করতে লাগল। দৈবক্রমে একটি খেঁজুর গাছটি থেকে খসে গিয়ে বৃক্ষতলে শায়িত লোকটির গালের ওপর পড়ে তার গোঁফে এসে বেঁধে গেল। কিন্তু লোকটি এতই অলস যে হাত বাড়িয়ে খেঁজুরটিকে মুখে দেবে তা আর তার ইচ্ছা হল না। অথচ খেঁজুরটি খাবার লোভ তার ষোল আনা। পথের পাশ দিয়ে একজন লোক যাচ্ছিল। তাকে দেখতে পেয়ে লোকটি বলল, 'মশাই যদি দয়া করে আপনার বাঁ পায়ের কড়ে আঙ্গুল দিয়ে আমার গোঁফের ওপরকার খেঁজুরটা ঠেলে মুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে যান ত বড় উপকার হয়।

পথচারী তার জীবনে এমনতর অলস ব্যক্তি পূর্বে আর কখনও দেখেনি। সে তাই খুবই বিস্মিত হল। বললে, 'তোমার মত কুঁড়ে আমি দুনিয়াতে দুটি দেখিনি।' কি পুরস্কার চাও বল। শুনে লোকটি অম্লান বদনে বললে, 'আজ্ঞে করচে গুঁজে দিয়ে যান ত নিতে পারি।'

গোদা পায়ের লাথি :

এক গোবেচারা ভদ্রলোকের খুব দজ্জাল স্ত্রী ছিল। স্ত্রীর পায়ে ছিল গোদ। স্ত্রী স্বামীকে সব সময় শাসন করত আর বলত যে তেমন কিছু করলে তার গোদা পায়ের লাথি খাবে। গোবেচারা স্বামী ভয় পেত সত্যি সত্যি স্ত্রীর গোদা পায়ের লাথি খেলে সে বুঝি আর বাঁচবে না। একদিন ক্রোধের বশবর্তী হয়ে স্ত্রী সত্য সত্যই স্বামীকে তার গোদা পায়ের লাথি মারলে। কিন্তু স্বামী দেখলে সে যতখানি আঘাত পাবে ভেবেছিল, তার কিছুই লাগেনি। কারণ গোদা পায়ের নরম মাংসে আঘাত বেশি হয় না।

গুড় ব্যাঘ্র :

এক ব্যক্তি তার চাকরকে নির্দেশ দিল সে যেন জনৈক মধু সিংহের বাড়িতে একটি পত্র দিয়ে আসে। চাকরটি পথিমধ্যে মধু সিংহ নামটি বিস্মৃত হয়ে ভাবলে তার মনিব যে নামটির উল্লেখ করেছেন, তাতে কিছু মিষ্টত্ব ও ভয়ানকত্ব আছে। অতএব সে মধুর পরিবর্তে গুড় এবং সিংহ স্থলে ব্যাঘ্র এই উভয় যোগ করে 'গুড় ব্যাঘ্র' উল্লেখ করে গুড় ব্যাঘ্রের বাড়ীর অনুসন্ধান করে। মধু সিংহ মশায়ের বাড়ী ছিল বালী গ্রামে।

গৌরাঙ্গ কাঠ :

এক ভদ্রলোক জনৈক রসিক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করলেন যে গৌরাঙ্গ অর্থাৎ বিষ্ণু কাঠে পরিণত হলেন কেন? বলাবাহুল্য পুরুষোত্তমে

জগন্নাথদেবের দারুময় মূর্তিকে উপলক্ষ্য করেই প্রশ্নটি করা হয়েছিল। উত্তরে পণ্ডিত বললেন—

একাভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা—
চঞ্চলাচ দ্বিতীয়া,
পুত্রোপ্যেক ত্রিভুবনজয়ী
মন্মথো দুর্নিবার ঃ
শেষং শয্যা শয়ন মুদধিঃ
বাহনং পন্ন গারি
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং
দারু ভূতো মুরারি।

অর্থাৎ এক স্ত্রী (সরস্বতী) ভীষণ মুখরা, তাঁর বাক্যস্রোত এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ থাকে না, দ্বিতীয়া স্ত্রী (লক্ষ্মী) চিরচঞ্চলা—এক স্থানে স্থির থাকা তাঁর স্বভাবে নেই। মন্মথ নামে ত্রিভুবনজয়ী পুত্রটি অতি দুরন্ত, তাকে শাসন করাই কঠিন। বিছানাটি অপূর্ব, শেষ সাপের দেহ, তার ওপর শয়ন সমুদ্রের ওপর। বাহনটি আবার সাপ খায়। গৃহস্থালীর এইসব চিন্তা করেই গৌরাঙ্গ কাঠ হয়েছেন।

ঘরে ঘরে ঃ

একদিন মেয়েদের মহলে কার সঙ্গে কার বিয়ে হয়েছে, এই সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিল একটি ছোট ছেলে। সে তার মা'র কাছে জানতে চাইল, 'মা তোমার কার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে?' মা আর কি বলেন, লজ্জায় চুপ করে রইলেন। অন্য একজন জবাব দিল, 'তোর বাবার সঙ্গে।' ছেলেটি তখন অবাক হয়ে বললে, 'বাঃ 'ঘরে ঘরে।'

ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি ঃ

দুই ভাই ছিল ঘুঘু ও ফাঁদ। ঘুঘু ছিল গোবেচারা ধরণের।

এক গৃহস্থের বাড়ী ঘুঘু গেল চাকরী করতে। চাকরীর শর্ত হল—দাঁড়ালে ছেলে ধরবে, বসলে পাট কাটবে, আজ খাবে কাল খাবে, খাওয়ার পূর্বে ইচ্ছামত এক খোরা আমানি খেয়ে যত খুশী সে ভাত খাবে। এছাড়াও ঠিক হল যদি ঘুঘু চাকরী ছাড়ে তবে মনিব তার কান কেটে নেবে, বিপরীত ক্রমে মনিব যদি তাকে ছাড়ায় তবে সে মনিবের কান কাটবে। অল্প দিনেই ঘুঘুর খেটে খেটে এবং সেই সঙ্গে না খেতে পেয়ে করুণ অবস্থা দাঁড়াল। সে প্রাণ বাঁচাতে মনিবকে কান দিয়ে সরে পড়ল। তখন তার জায়গায় চাকরি নিল ফাঁদ। শর্ত ঘুঘুর মতই। সে দাঁড়ালেই গিন্নী তাকে ছেলে দেয়, সে ছেলের একটা হাত বা পা ধরে ঝুলিয়ে রাখে। ফলে ছেলে কাঁদতে থাকে। কোলে করতে বললে ফাঁদ তা করতে অস্বীকার করে শর্তে নেই বলে। বলে শুধু ছেলে ধরার শর্ত আছে। সে বসলে তাকে পাট দেওয়া হয়। ফাঁদ দা নিয়ে সেই পাট কুচি কুচি করে কাটে। কেউ কিছু বললে সে বলে পাট কাটার শর্ত ছিল, পাট পাকাবার কোন শর্ত ছিল না। খাবার সময় সে কলাপাতে এক খোরা আমানি ঢেলে দেয়। কারণ খোরায় করে খেতে হবে এমন কোন শর্ত ছিল না। ফলে পাতায় যেটুকু আমানি থাকে, তাই গণ্ডূষ করে গাণ্ডেপিণ্ডে ভাত খায় সে। গৃহস্থ লোক বিরক্ত হ'য়ে তাকে একদিন বললে, 'যা বেটা দূর হয়ে যা'। আর যায় কোথা, ফাঁদ অমনি একটি ক্ষুর বের করে মনিবের কান কেটে বললে, 'ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ ত দেখনি।'

চোরের আবার পুরুত:

দুই ব্রাহ্মণ তাদের এক প্রতিবেশীর গাছের পাকা কাঁঠাল দেখে প্রলুব্ধ হলো এবং ঠিক করল কাঁঠাল চুরি করবে। রাত্রিবেলায় দু'জনে কাঁঠাল গাছের তলায় হাজির হয়ে দেখলে কাঁঠালগুলি তাদের হাতের নাগালের মধ্যে নয়। তাই প্রথম ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় জনকে বললে তার কাঁধে উঠে কাঁঠাল পাড়তে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ প্রথম ব্রাহ্মণের প্রস্তাবে সম্মত হল না। কারণ স্বরূপ সে বললে প্রথম ব্রাহ্মণ তার

পুরোহিত। পুরোহিতের গায়ে সে পা দিতে পারবে না। তখন প্রথম ব্রাহ্মণ রেগে বললে চুরি করতে এসে আবার পুরোহিতের প্রতি মর্যাদা দেখান। এই চীৎকারে প্রতিবেশীর ঘুম ভেঙে গেল। কাঁঠাল চুরি আর হল না।

চোঁকর আর চাঁকর :

জাম বলে ভুল করে জনৈক ব্যক্তি একটি ভ্রমরকে মুখের মধ্যে পুরে ফেললে ভ্রমরটি মুখমধ্যে অন্তরীণ হয়ে চোঁ চোঁ করতে থাকে। এই থেকেই প্রবাদটির সৃষ্টি হয়েছে।

চোর সন্ন্যাসী তুম্ব নাড়ে :

একটি চোর দীর্ঘকাল ব্যাপী চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করার পর নিজের মনেই খুব অনুতপ্ত হল। সে ঠিক করলে চৌর্যবৃত্তি পরিত্যাগ করে অবশিষ্ট জীবন সৎসঙ্গে সৎকার্যে অতিবাহিত করবে। সেইমত সে সন্ন্যাস নিল এবং সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বাস করতে লাগল। কিন্তু সন্ন্যাস নিলে কি হয়, দীর্ঘদিনের চুরি করার অভ্যাস তাকে বড়ই বিচলিত করে তুলত। চুরি করার জন্য তার হাত নিস্‌পিস্ করত। কিন্তু সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর চুরি করবে না। শেষে হাতের চাঞ্চল্য প্রশমনের জন্য সে রাত্রে সন্ন্যাসীরা নিদ্রিত হলে একজনের তুম্ব সরিয়ে অন্যের কাছে রেখে আসত। আর এইভাবে সে হাতের সুখ করত। অথচ চুরিও করতে হত না।

চারপেয়ের ধারাই এই :

একটি পুকুরে মাছ এবং অন্যান্য জলচর প্রাণীরা সেই পুকুরেরই অন্যতম বাসিন্দা ব্যাঙকে মোটেই সুনজরে দেখতনা, দেখতনা তার কারণ ব্যাঙ জলচর প্রাণীদের মত শুধু জলেই থাকে না সে আবার স্থলেও

বিচরণে পটু। উভচর ব্যাঙ তাই উপহাসাস্পদ ছিল। বেচারী ব্যাঙ মনে মনে খুব অসন্তুষ্ট হ'য়ে তার প্রতি আচরণের উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়ার অপেক্ষায় রইল।

একদিন একটি হাতী পুকুরটির ধার ধরে চলে গেল। তার চলন দেখে জলচর প্রাণীরা ত হতবাক। নিজেদের মধ্যে তারা হাতীর সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে দিল। ব্যাঙ দেখলে এই সুযোগ। সে নিজেকে হাতীর শ্রেণীভুক্ত করার প্রলোভন আর সংবরণ করতে পারলে না, 'বললে আমাদের সব চারপেয়ের চলনই ঐ রকম।'

চাঁওড়ি, বাঁওড়ি, মকর,
এখ্যান, ছেঁছান, ঘেঁঘান,
ছোলা-কাচড়া টুকি-ঝাড়া
রাঁই-রুঁই, সাঁই-সুঁই,
তার বিহানে আসবি তুঁই।

আদ্রা—আসানসোল রেলপথে পড়ে ছোট স্টেশন বেড়ো। এখান থেকে মাইল খানেক দূরে অনুষ্ঠিত হয় খেলাই চণ্ডীর মেলা। পয়লা মাঘ থেকে শুরু হয়ে তিন দিন ধরে চলে মেলাটি। মকর স্নানের পরই এতদঞ্চলের চাষী, বাগাল, রাখাল, মুনিষ, মাহিন্দার সকলে মেলায় মেতে ওঠে। এই মেলাকে কেন্দ্র করে প্রসঙ্গটি সৃষ্ট। বলা হয়েছে এটি খাতকের টাকার তাগাদায়। তখন খাতক মহাজনকে বলছে যে মেলায় কয়েকদিন সে ভয়ানক ব্যস্ত থাকবে (প্রবাদের হিসাবে প্রায় দশদিন)। কিছুতেই সে সময় করতে পারবে না। তাই কয়েকদিন পরে যখন মেলা শেষ হয়ে গেলে যখন সাঁই-সুঁই চুপচাপ হবে, তখন তার পক্ষে কিছু কাজকর্ম করা সম্ভব হবে। তাই মহাজন যেন সাঁই-সুঁয়ের পরের দিন আসে।

চৈতার বৌয়ের টাকা :

বাংলা দেশের মানুষের বিশ্বাস 'বৌ কথা কও' পাখী 'চৈতার বৌ

গো, টাকা দাও গো' বলে ডাকে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাহিনীটি হল এই যে এক শাশুড়ী তার পুত্রবধূর কাছে কিছু টাকা রাখতে দিয়েছিলেন। বধূটি শাশুড়ীকে প্রবঞ্চিত করার জন্য পাখী হয়ে উড়ে যায়। তখন শাশুড়ীও পাখী হয়ে তার অনুসরণ করতে থাকে এবং ক্রমাগত টাকার জন্য বলতে লাগল।

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই :

কয়েকজন চোর রাত্রিবেলায় চুরি করতে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ তাদের খেয়াল হল যে রাত শেষ হবার আর বেশি দেরী নেই। সুতরাং অনতি-বিলম্বে আত্মগোপন করতে না পারলে ধরা পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। তারা যখন কি ভাবে আত্মরক্ষা করবে এই চিন্তায় ব্যস্ত, এমন সময় এক বৃদ্ধ প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনের জন্য তার ঘর থেকে বের হল। চোরেরা সুযোগ পেয়ে গেল। তারা সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধটির ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। তারপর তার ঘর থেকে একটি দড়ি দ্বারা প্রস্তুত চারপেয়ের ওপর তাদের চুরি করা সব জিনিসপত্র রাখল। এরপর এগুলি মাদুর দিয়ে বাঁধলে যেন মৃতদেহ। তারপর খাটের ওপর একটি কাপড় বিছিয়ে দিল। এরপর চোরেরা খাটটিকে কাঁধে করে বহন করতে লাগল আর মুখে বলতে লাগল 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।'

পথিকেরা প্রাতঃকালে মড়া দেখে সব পথের পাশে সরে দাঁড়াতে লাগল। চোরেরা নির্বিঘ্নে পথ চলতে লাগল।

এদিকে আর একটি চোর সারারাত ঘুরেও কিছুই চুরি করতে না পেরে উদাসমনে ঐ পথ দিয়েই ফিরছিল। সে চারপেয়ের নিচে গাড়ুর নল দেখতে পেয়ে বাহকেরা যে চোর তা বুঝতে পারল। যখন চোরেরা বলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, তখন শেষের চোর বলে, 'ঐ নল দেখা যায় রে।' আগের চোরেদের ত চক্ষু স্থির। বুঝলে তারা ধরা পড়ে গেছে। তাই তারা শেষের চোরকে বললে, 'ভাগ নেবে ত এসো।'

শেষোক্ত চোর এই আহ্বানে মহা খুশী হল। সে 'কবে মরেছে মেসো' বলে বাহকদের সঙ্গে যোগ দিল।

ছাতুর হাঁড়িতে বাড়ি পড়া ঃ

এক ছিল দরিদ্র ব্রাহ্মণ। ভিক্ষা করে তার জীবিকা নির্বাহ হত। ভিক্ষা করে সে যে ছাতু খেত, তার সবটা না খেয়ে কিছু পরিমাণে ছাতু সে একটা হাঁড়িতে সঞ্চয় করত। এইভাবে হাঁড়িটি ছাতুতে পূর্ণ হতে থাকল।

একদিন ব্রাহ্মণ রাত্রে শয়ন করে ভাবতে লাগল যে দেশে যদি দুর্ভিক্ষ হয়, তবে চড়া দরে সঞ্চিত ছাতু বিক্রয় করে সে বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করবে। তারপর ঐ অর্থে সে ব্যবসা আরম্ভ করে প্রভূত সম্পদের অধিকারী হবে। ধনী হবার পর সে এক ধনী কন্যাকে বিবাহ করবে। যথাসময়ে তার একটি পুত্র সন্তান হবে। শিশুপুত্র যখন তাকে বিরক্ত করবে তখন সে লাঠির দ্বারা আঘাত করে পত্নীকে শাসন করবে। এই মনে করে সে এমন লাঠি চালাল যে ছাতুর হাঁড়িটিই সেই আঘাতে চুরমার হয়ে গেল।

জুতোর বাড়ো মেরেছে, অপমান তো করতে পারে নাই ঃ

মেদিনীপুর জেলার প্রজারা সহজে খাজনা দেয় না। এজন্য তারা জুতার দ্বারা প্রহৃত হলেও অপমানিত বোধ করে না। কিন্তু তাদের গলায় হাত দিলে তারা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে। এই থেকেই প্রবাদটির উৎপত্তি।

ঝাঁকের কই ঝাঁকে থাক ঃ

এক লোভী গোস্বামী গিয়েছিল তার শিষ্যবাড়ী; সঙ্গে ছিল তার এক ভৃত্য। গোস্বামী অন্যের হাতের ছোঁয়া খাবে না। তাই ভৃত্যটি

তার খাবারের সব যোগাড় করে দিল। সে গোস্বামী প্রভুর জন্য ডিমওয়ালা বড় বড় অনেকগুলি কইমাছ এনেছিল। গোস্বামী দিব্বি মনোমত রান্না বান্না করে ভাত বাড়লে। একদিকে ভৃত্যকেও খেতে দিলে। কিন্তু রান্না করা মাছের সবগুলি নিজে নিয়ে একটি মাত্র মাছ সে ভৃত্যটিকে দিলে। তাও আবার সেই মাছটির ডিম ছিল না। ভৃত্যটি এরকম বণ্টনের বহর দেখে খুবই ক্ষুব্ধ ‹ল। সে নিজের মাছটি গুরুদেবের ঝোলের পাত্রে ছুঁড়ে দিয়ে বললে 'ঝাঁকের কই ঝাঁকে থাক।' পরিণামে বেচারী গোস্বামীর আর মাছ খাওয়া হল না। সবকটি মাছই ভৃত্য খেল।

টুনী কথা কসূনে, টুনী কথা কসনে।
বরযাত্রীর জুতো কুকুরে নেয়, টুনী কি সে কথা না কয়।

এক কন্যা ছিল অতিশয় মুখরা। তার মাতা পিতার আশঙ্কা ছিল মেয়েটি বিবাহ বাসরে কিংবা ছাতনা তলাতে গিয়েও কথা বলে ফেলবে। তাই তাকে তার মা-বাবা বরংবার করে নিষেধ করে দিয়েছিলেন নীরব থাকার জন্যে। এদিকে কনের পিঁড়িতে বসা অবস্থায় মেয়েটি দেখতে পেলে কুকুরে বরযাত্রীর জুতো নিয়ে পালাচ্ছে। আর যায় কোথা, মেয়েটি তার নীরবতা ভঙ্গ করে কথা বলে উঠল।

ডিপুটী ঘটিরাম ঃ

এক ডেপুটির এজলাসে মুচিরাম নামে এক ফরিয়াদীর নালিশ ছিল। ডেপুটি বাবুটির বাংলায় তেমন দক্ষতা ছিল না। তাই তিনি মুচিরামের স্থানে পড়লেন ঘটিরাম। পেয়াদা হাঁকতে লাগল ঘটিরাম ফরিয়াদী হাজির কি না। কেউ কোন সাড়া দিল না। ফলে ডেপুটিবাবু মোকদ্দমাটি খারিজ করে দিলেন। পরে মুচিরাম ব্যাপারটি জানতে পেরে ছুটতে ছুটতে ডেপুটি বাবুর কাছে এসে হাজির হল। বললে তার নাম ঘটিরাম

নয়, মুচিরাম। তাই ঘটিরাম হাজির কিনা পেয়াদার এই কথা সে ধরতে পারেনি। হাজিরও হতে পারে নি। কিন্তু ডেপুটি বাবুটি নিজের সম্মান রক্ষার্থে বললেন, তা হতেই পারে না। তার নাম ঘটিরামই। মিথ্যা করে সে এখন তার নাম বলছে মুচিরাম। এই ঘটনার পর থেকে ডেপুটি বাবুটি ঘটিরাম ডেপুটি নামে পরিচিত হন।

ঢেঁকী অবতার ঃ

এক সময়ে এক ঠাকুর, এক শিষ্যগৃহে পদার্পণ করেছিলেন। ঠাকুর ঠিক করলেন শিষ্যগৃহে অসাধারণ সংযম ক্ষমতা এবং আহারাদি বিষয়ে তাঁর চরম ঔদাসীন্য দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করবেন।

সময়টা মাঘ মাস। প্রচণ্ড শীত। আবার শিষ্যও বেশ অবস্থাপন্ন। তাই সে গুরুর জন্য পালঙ্ক, পালঙ্কের ওপর—পুরু বিছানা, তাতে লেপ, বালিশ ইত্যাদি দিয়ে গুরুকে তাতে শোবার জন্য অনুরোধ করলে।

গুরু শিষ্যের কথায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন তিনি শিষ্যের মত বাবুগিরি করেন না। কৃচ্ছ্রসাধনাই তাঁর আদর্শ। তিনি শিষ্যের আয়োজিত শয্যা গ্রহণে অসম্মত হলেন। পালঙ্কে শোয়ার পরিবর্তে তিনি ঘরের মেঝেতে শোয়ার বাসনা জানালেন। বললেন তাঁর কেবল একটি মাদুরের প্রয়োজন আর প্রয়োজন এক আঁটি খড়ের। এতেই তাঁর রাত কাটবে বলে তিনি বললেন। শিষ্যও আর কথা না বাড়িয়ে গুরুর ইচ্ছামত তাঁর শয়নের আয়োজন করলে।

গুরুঠাকুর মেঝেতে একটি মাদুর বিছিয়ে বিচালীর বালিশ মাথায় দিয়ে একটি মাত্র কম্বল সম্বল করে শয়ন করলেন।

শিষ্য বাড়ীতে গুরুর রাত্রিকালীন আহারটা কিঞ্চিৎ গুরুতর হয়েছিল। তাই তাঁর শরীর কিছু গরম হয়ে উঠল এবং মাঘের শীতেও দিব্বি মাদুরের ওপর শুয়ে পড়লেন। রাত্রির প্রথম প্রহর এইভাবেই কাটল। দ্বিতীয় প্রহরে শীত একটু অধিক মনে হওয়ায় গুরুদেব দেহটিকে একটু বেঁকিয়ে পড়ে রইলেন। একটি কম্বলে আর শীত কমে না। কিন্তু

লেপ বা অন্য কোন গরম আচ্ছাদন চাইতে তাঁর লজ্জা হ'ল।

তৃতীয় প্রহরে শীতের প্রকোপ আরও তীব্র বলে অনুভূত হল। বাড়ীর সকলেই গভীরভাবে নিদ্রামগ্ন। তাই অত রাতে কারোর ঘুম ভাঙ্গাতে তাঁর লজ্জা হল। শরীরকে আরও একটু বেঁকিয়ে দুটো জানু বুকের কাছে এনে কোন প্রকারে শীত নিবারণ করতে লাগলেন।

চতুর্থ প্রহরে শীতের তীব্রতায় গুরুদেবের প্রাণ সংশয়াপন্ন হয়ে উঠল। বহু কষ্টে তিনি নিঃশ্বাস রোধ করে জানু, বুক এবং মাথা একত্রে করে অবশিষ্ট রাতটুকু অতিবাহিত করলেন।

গুরুঠাকুরের এই ভণ্ডামী একজন শিষ্যের বড় অসহ্য মনে হল। সে সারারাত গুরুর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছিল। পরদিন সকলে যখন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁর রাত কেমন কেটেছে, তিনি অম্লান বদনে বললেন বেশ ভালই কেটেছে, কোন কষ্টই তাঁর হয়নি, কারণ ব্রহ্মচর্যের মহিমাই এমনি।

এই কথা শুনে উচিত বক্তা শিষ্যটি বলে উঠল :

প্রথম প্রহরে প্রভু ঢেঁকী অবতার
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু ধনুকে টঙ্কার
তৃতীয় প্রহরে প্রভু বেনের পুঁটলী
চতুর্থ প্রহরে প্রভু কুকুর কুণ্ডলী

এই কথায় গুরু খুবই লজ্জা পেলেন, তাঁর শিখাসহ মাথাটি সামনের দিকে ঝুলে পড়ল।

ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার :

নিধিরাম নামে একজন নিজেকে সর্দার বলে পরিচয় দিত। ভাব-খানা তার এমন যেন তার মত পালোয়ান দ্বিতীয়টি আর নেই। একদিন নিধিরামের গ্রামেই ডাকাত পড়ল। দেখা গেল নিধিরাম নির্বিকার। ডাকাত প্রতিরোধে তার কোনই ভূমিকা নেই। ডাকাতদল চলে যাবার পর নিধিরামকে তার নিষ্ক্রিয়তার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে জবাব

দিলে ঢাল তলোয়ার ইত্যাদি পেলে সে তার ক্ষমতার বহর দেখাত। কিছু ছিল না বলেই তাকে নিষ্ক্রিয় থাকতে হয়েছে। নিধিরামের আসল বাড়ী ছিল বর্ধমানের কোন এক গ্রামে। তাকে দেখতে ছিল যেমন কদাকার, তেমনি ছিল সে লম্বা। তার অবশ্য অনেকগুলি গুণ ছিল। সে খেলাধুলায় ছিল পারদর্শী, সমাজ-সেবামূলক কাজেও সে ছিল অগ্রণী। নিধিরামের একটি কীর্ত্তনীয়ার দলও ছিল। দলটি বিভিন্ন পূজা পার্বণে, নানাস্থানে নৃত্য-গীত পরিবেশন করত। এইভাবে অর্জিত অর্থ সবই দরিদ্র নারায়ণের সেবায় সে দান করে দিত। দলের সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে বলত সর্দার। তবে তার ছিল বিচিত্র স্বভাব এবং খামখেয়ালী-পনা সেজন্যে সে ঠকেওছে।

তাঁতীকুলও গেল, বৈষ্ণবকুলও গেল ঃ

এক তাঁতী মনে মনে ভাবলে আর তাঁত না বুনে বৈষ্ণব হ'য়ে বেশ বসে বসে খাবে। আর পরিশ্রম করতে হবে না। সত্য সত্যই সে বৈষ্ণবের ভেক ধারণ করল। ভেক নেবার পর আখড়ার মোহান্ত তাঁতীকে পাঠাল ভিক্ষা করে আনতে। তাঁতী ভিক্ষায় অনভ্যস্ত। সে ভাবলে এর থেকে তার তাঁত চালানোই ছিল ভাল। দোরে দোরে ঘুরে ভিক্ষা করার কষ্ট করতে হত না। সে মোহান্তের কাছে জানালে তার দ্বারা ভিক্ষা করা সম্ভব হবে না। এই কথা শুনে ক্ষুব্ধ মোহান্ত তাকে আখড়া থেকে তাড়িয়ে দিল। এদিকে বৈষ্ণবের ভেক নেওয়ায় তাঁতী সমাজেও তার আর স্থান হল না।

তকে কি চুষছি, কপাল গুণে নেজা মুড়া চুষছি ঃ

এক ছিল বুড়ো তার এক ছিল বুড়ী। দীর্ঘদিন দু'জনের মধ্যে ছিল কথা বন্ধ। তাদের কোন ছেলেপুলেও ছিল না। বুড়ী রান্না-বান্না করে বুড়োর জন্যে খাবার ঢাকা দিয়ে রাখে আর নিজে খায়। কথা বন্ধে

বুড়ীর কোন অসুবিধা না হলেও বুড়ো খুবই অসুবিধা বোধ করে আর সুযোগ খোঁজে কিভাবে আবার কথাবার্তা শুরু করা যায়।

তখন শীতকাল। ভোরবেলায় বুড়ো উঠে তাপ নিচ্ছিল শীত কাটাবার জন্যে, আর ইচ্ছে করে নিজের কাপড়ের খুঁটটাকে আগুনের সামনে মেলে ধরলে। কাপড়ে আগুন ধরল। বুড়ী তা দেখতে পেয়ে প্রত্যক্ষভাবে না বলে শুধু বললে কারুর যদি কোঁচা বা কাঁচায় আগুন লাগে তাতে তার আর ক্ষতি কি? বুড়োর কথা বলার একটা সুযোগ চলে গেল।

বুড়ী এরপর গেল স্নান করতে। বাঁধে গিয়ে দেখল গাঁয়ের লোকে মাছ ধরছে। বাড়ী এসে বুড়ী বললে, 'গ্রামের সব লোকেই মাছ ধরে কেবল একজনই ধরে না।'

বুড়ো বুঝলে তাকে লক্ষ্য করেই বুড়ী বলছে। সঙ্গে সঙ্গে সে জবাব দিলে জাল পলই কিছুই নেই তা যাবে কি করে? বুড়ী এরপর পড়শীর কাছ থেকে একটা পলই চেয়ে নিল। এরপর বুড়ো মুড়িটুড়ি খেয়ে নিয়ে মাছ ধরতে চলল। সে যোলটা মাছ ধরে ফেললে। বুড়ী ত মাছ দেখে বেজায় খুশী। সে তাড়াতাড়ি বুড়োকে স্নান করার তেল বের করে দিল।

বুড়ী এবারে মাছগুলি কেটে বেছে ধুয়ে নিয়ে ভাল করে ঝোল রাঁধলে। তারপরে একটা একটা করে নিজেই প্রায় সবকটি মাছ খেয়ে ফেললে। অবশিষ্ট রইল মাত্র একটি। বুড়োর জন্য একবাটি ঝোলে মাছটি তিন টুকরো করে রেখে দিল।

ওদিকে বুড়ো স্নান করে খেতে বসে বাটিতে হাত দিয়েই হতভম্ব, মাছ কোথায়? বুড়ী এরপর মাছের হিসাব দিতে বসল। বললে, যে পলই ধার দিয়েছিল, তাকে দিতে হয়েছে দুটি। বৈদ্যকে দিতে গেছে দুটি। ভাট-ব্রাহ্মণকে দিতে গেছে দুটি। বুড়োও হিসেব রেখে যাচ্ছে ঠিকমত। এখনও দশটি মাছ থাকার কথা। বুড়ী বললে, 'দুই গেল ঘস দুই গেল কাট।' এরপরও বুড়ী হিসাব দাখিল করে চলল। বললে, 'দুই ভাজতে ভাজতে ক্ষয়।' বুড়ো বললে তাহলেও চারটি মাছ থাকার কথা। বুড়ী বললে, 'দুই নিল চিল মহার,' বুড়ো বললে, তবুও দুটি থাকার কথা। বুড়ী বললে দুটির মধ্যে একটি খেয়েছে বিড়াল। আর একটি বুড়োর

জন্যে রেখে দিয়েছে। বুড়ীর জন্যে সেটির পেটটা রেখে লেজা আর মুড়ো খেয়েই বুড়োকে সন্তুষ্ট থাকতে হল। ভাবলে আর কথা বাড়িয়ে ফের কথা বন্ধ করে লাভ নেই। শুধু বললে, 'তকে কি চুষছি কপাল গুণে লেজ মুড়া চুষছি।'

তাই দাদা :

দুই ভাই নদী পার হচ্ছিল। বড়টি বড় বুদ্ধিমান বলে পরিচিত, কিন্তু ছোট ভাইটির খ্যাতি ছিল অন্যরূপ। ছোট ভাই নদী পার হ'তে হ'তে বুদ্ধিমান দাদাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা দাদা, নদীর এক পাড় উঁচু, আর এক পাড় নীচু কেন ?'

বড় ভাইটি গম্ভীর ভাবে বললে 'তা আর জানিস না ? এটা এপার আর ওটা ওপার।'

ছোট ভাইটি সবই বুঝল, বুঝল দাদার বুদ্ধির দৌড়। মুখে তাই বললে, 'তাই দাদা।'

তো অদ্ধম মো অদ্ধম :

কোন কৈবর্ত্যের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সেই কৈবর্ত্য কার্পাস ক্ষেতের অর্থাৎ চাষের তূলার ভুজ্জি দেওয়াতে অন্য কৈবর্ত্যের পুরোহিত জানতে চায় যে তার কি প্রাপ্য হবে। উত্তরে ঐ কৈবর্ত্যের পুরোহিত বলে, 'তোমার অর্দ্ধেক আর আমার অর্দ্ধেক হিসাবে ভাগ হবে।'

তাঁতী না ছাড়ে পীঠার বায়
আমার কুঁচা পীঠাটায় চাই।

এক গ্রামে এক তাঁতী ছিল। তার ছিল দুটি ছেলে। একজনের নাম লেলা, আর একজনের নাম পেলা। এদের কাজ ছিল গোটা গ্রামের গরু ছাগল চরান। বাড়ীতে এদের ছিল বুড়ী মা আর কেউ নয়।

একদিন বুড়ী মা বাড়ীতে পিঠে তৈরী করল। লেলা পেলাকে মাঠে রেখে খাবার খেতে বাড়ী এল। পিঠের মিষ্টি স্বাদ পেয়ে লেলা তার ভাগের ছাড়াও পেলার ভাগের পিঠেও খেয়ে ফেলল।

এরপর পেলা বাড়ীতে খেতে এসে তার ভাগ পেল না। বুঝলে তার দাদার কীর্তি। পেলা প্রায়ই দাদার কাছে তার ভাগের পিঠের জন্য বায়না করে।

একদিন লেলা পেলাকে দুটি কাজের ভার দিয়ে বাড়ী পাঠালে। কাজ দুটির একটি হ'ল গাঁয়ের লোকদের কাছ থেকে সেরা পুয়া (চাল মাপের পাত্র বিশেষ) সংগ্রহ করে বাড়ীতে আনা এবং দ্বিতীয়টি হ'ল মাকে স্নান করান। পেলা গোটা গ্রামের সব সেরা পুয়া সংগ্রহ করে একটা হাঁড়িতে রেখে উনুনে সেদ্ধ করতে বসিয়ে দেয়। আর তারপর এক হাঁড়ি গরম জল ঢেলে মাকে পুড়িয়ে মারে। তারপর মায়ের মৃতদেহটা বারান্দায় ঠেস দিয়ে রেখে সে ফের মাঠে যায়। এদিকে লেলা বাড়ী ফিরে দেখে সর্বনাশ। মা ত মারা গেছেই, তার ওপর গ্রামের সকলের সেরা পুয়া গুলো সেদ্ধ করে ফেলেছে পেলা।

গ্রামের লোক পাছে তাদের সেরা পুয়ার জন্য মারধোর করে তাই সাবধান করতে লেলা মাঠে ছুটে আসে। এসে দেখে আর এক বিপদ। ছাগল চরাতে গিয়ে পেলা ঢিল ছুঁড়ে একটি ছাগলকে মেরে ফেলেছে। দু'ভায়েরই খুব খিদে পেয়েছিল। কি আর করে। মরা ছাগলটাকে পুড়িয়ে খেলে দু'জনে। এরপর দু'জনে ঠিক করলে পালিয়ে যাবে। পেলা যাবার সময় মরা ছাগলের নাড়ী ভুঁড়ি নিয়ে যাবার বায়না ধরলে। লেলা বাধা দিতেই পেলা তার ভাগের পিঠে দাবী করে বসলে। অগত্যা সে পেলার দাবী মেনে নিল। অনেকদূর যাবার পর দু'ভাই সন্ধ্যা নাগাদ একটা বটগাছের কাছে এসে পৌছাল। আত্মরক্ষার জন্য দু'জনে গাছে চড়ে বসল। এদিকে এক রাজকুমার লোক লস্কর নিয়ে বিয়ে করে ফিরছিল। তারাও ঐ বটগাছের তলায় শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগল। পেলা দাদাকে বললে, সে পাঁঠার ভুঁড়ি রাজার ওপর ফেলে দেবে। লেলা বারণ করতেই পেলা ফের তার পিঠের দাবী জানালে। লেলা আর

কোন আপত্তি করতে পারল না। পেলা হঠাৎ ঝপাৎ করে যেই ভুঁড়ি রাজার পেটের ওপর ফেলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে সব পালালে। দু'ভাই গাছ থেকে নেমে এসে রাজার লোকেদের ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র সব সংগ্রহ করে নিল। পেলা যেই ডোমের ফেলে যাওয়া ঢোলটি নিতে গেল, লেলা তখন নিষেধ করলে। পেলা সে নিষেধ মানবে কেন। সে তার মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করল—দাবী জানালে তার পিঠের। আর কি, লেলা মেনে নিল পেলার কথা। ঢোল নিয়ে চলল পেলা। পথে এক জায়গায় তারা এক ঝাঁক ভীমরুল দেখতে পেল। পেলা বায়না ধরলে ভীমরুল গুলি নেবে। লেলা বাধা দিয়ে বললে, পেলা তাহলে ভীমরুলের কামড়েই মারা পড়বে। আবারও পেলা তার পিঠের বায়না ধরলে। লেলা চুপ। তবে সে আর পেলার সঙ্গে থাকতে চাইল না। বিপদের আশঙ্কায় লেলা পেলাকে ত্যাগ করলে। পেলা ভীমরুলের চাকের কাছে গিয়ে বললে ঃ

'আসবি সিতা ঢোলে মামা।'

ভীমরুলগুলো অমনি সব একে একে ঢোলে গিয়ে ঢুকলে। পেলা অবশ্য আগেই ঢোলটির একটি মুখে ছেঁদা করে নিয়েছিল। ভীমরুলসহ ঢোল নিয়ে যেতে যেতে এক জায়গায় পেলা দেখলে রাজার ধোপা কাপড় কেচে শুকোতে দিয়েছে। পেলা তার থেকে ভাল জামা কাপড় নিয়ে নিজে পরে নিল। ধোপা রাজাকে খবর দিল। রাজা এলেন লোকজন নিয়ে পেলাকে শাস্তি দিতে। তখন পেলা ঢোলে চাপড় মেরে বললে ঃ

বিধবি সিতা ছেঁক ছেঁক।

অমনি ভীমরুলগুলো বেরিয়ে রাজার লোকজনকে আক্রমণ করলে। রাজা তখন কথা দিলেন তাঁর মেয়ের সঙ্গে পেলার বিয়ে দেবেন। এই শর্তে পেলা ভীমরুল বাহিনীকে তার ঢোলের মধ্যে ফিরিয়ে নিল। ভাল দিন দেখে পেলার সঙ্গে রাজা তাঁর মেয়ের বিয়ে দিলেন। পেলার সুখেই দিন কাটতে লাগল।

তাইলো দিদি তাই ঃ

দুই বৈষ্ণবীর মধ্যে একজন প্রবীণা, অন্যজন নবীনা। প্রবীণাটি

বহুদিন পূর্বেই ভেক নিয়েছে, কিন্তু নবীনাটি ভেক নিয়েছে সম্প্রতি। তখনও নবীনাটির ভিক্ষা করতে কিংবা ভিখারিণীর মত বুলি আওড়াতে কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকত। প্রবীণাটি যখন গৃহস্থের বাড়ী উপস্থিত হ'য়ে গৃহস্থকে সম্বোধন করে উচ্চকণ্ঠে বলত, 'রাধাকৃষ্ণ বল মন, তখন নবীনা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলত 'তাইলো দিদি তাই।'

দশচক্রে ভগবান ভূত ঃ

এক রাজা ছিলেন। তাঁর এক মন্ত্রী ছিল, মন্ত্রীটি ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী। তার উদ্দেশ্য ছিল রাজাকে নিজের মুঠোর মধ্যে রাখা। রাজাও বলাবাহুল্য মন্ত্রীকে বেশ ভয় করে চলতেন। মন্ত্রীর কারণে রাজবাড়ীতে কারো কোনো অভীষ্ট পূর্ণ হ'ত না কিন্তু তা সত্ত্বেও মন্ত্রীর নামে রাজার কাছে নালিশ করার মত সাহসও কারো হত না। শেষে সকলে মিলে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করল।

একদিন সকালবেলা মন্ত্রী রাজসভায় যাবেন কিন্তু দারোয়ান জানাল, হুকুম নেই। মন্ত্রী অনেক চেষ্টা করলে কিন্তু রাজার সাক্ষাৎলাভ আর ঘটল না।

এদিকে রাজা মন্ত্রীর অনুপস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন ভগবানের মৃত্যু হয়েছে শুধু তাই নয়, ভূত হয়ে পাড়ায় বড় অত্যাচারও শুরু করেছে। সকলের মুখে ভূতের অত্যাচারের কথা শুনে রাজা সব কিছু বিশ্বাস করলেন।

একদিন সকালে রাজা চলেছেন গঙ্গাস্নানে। ভগবান তা জানতে পারলে কিন্তু রুষ্ট নাগরিকদের ভয়ে রাজার সঙ্গে খোলাখুলি দেখা করতে সাহস পেল না। সে পথিমধ্যেকার একটি গাছে চড়ে রইল। রাজা যেই সেই গাছতলা দিয়ে গেলেন, ভগবান গাছে বসে মহারাজকে সম্বোধন করলে। রাজা গাছের ওপর তাকিয়ে বললেন যতদিন মন্ত্রী জীবিত ছিল, ততদিন সে রাজাকে জ্বালিয়েছে। এখন ভূত হয়েও নিস্তার

নেই, রাজাকে জ্বালাতে চাইছে। তখন মন্ত্রী জবাব দিলে 'দশচক্রে ভগবান ভূত।'

"চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যঃ
ন সেব্যঃ কেবলং নৃপঃ
অতো চক্রস্য মহত্বাৎ
ভগবান ভূততাং গতঃ"

দয়া করে দেয় নুন, ভাত মারে দশগুণ ঃ

এক ছিল গৃহস্থ। গৃহস্থটি ছিল বড়ই কৃপণ। কখনই কাউকে কিছু দিতে তার হাত সরত না। একদিন এক ভিক্ষুক এই কৃপণ গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হ'য়ে এমন কাকুতি মিনতি করতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত ভিক্ষুকটিকে ভাত না দিয়ে তার আর উপায় রইল না। বাড়ীর গৃহিণী ভিক্ষুককে শুধু ভাত না দিয়ে কিঞ্চিৎ লবণ দিয়েছিল। কিন্তু ভিক্ষুক এই লবণের সাহায্যেই শুধু তাকে দেওয়া ভাতগুলিই যে ভক্ষণ করল তাই না, আরও ভাত চেয়ে সেগুলিও নুন দিয়ে খেলে। তখন গৃহস্বামী ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কথাটি বলেছিল।

দাদা হজম ঃ

একবার এক গুলিখোরদের আড্ডায় এক গুলিখোর পাতিলেবুর হজমি শক্তির খুব প্রশংসা করল। সঙ্গে সঙ্গে এক গুলিখোর এই বক্তব্য সমর্থন করে বললে যে তার একবার পেট ফেঁপেছিল। কবিরাজমশাই তাকে পাতিলেবুর রস খেতে বললে সে ছুরি দিয়ে পাতিলেবু কাটতে গিয়ে দেখে ছুরিটাই আর নেই। পাতিলেবুর রসের স্পর্শে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। এমনি পাতিলেবুর হজমী শক্তির গুণ। বেমালুম ছুরি হজমের কথা শুনে ত সকলে একেবারে থ। আর একজন গুলিখোর

তখন তার একটি কাহিনী শুরু করে। সে বলে, তার দাদার একবার খুব বদহজম হয়। সকাল সকাল স্নান করে পাতিলেবুর রস খেয়ে দাদা গায়ে জামাটি চড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে এবং দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ে। দুপুরবেলায় দাদাকে ভাত খাবার জন্য ডাকতে এলে দেখা গেল বিছানায় শুধু দাদার জামা আর কাপড়টি পড়ে রয়েছে, দাদা নেই।

অন্য গুলিখোররা জানতে চাইল, কেন দাদা কোথায় গেল ? বক্তা জানাল লেবুর রসে খোদ দাদাই হজম হয়ে গিয়েছিল।

ধানটির ভিতর চালটি ॥ ফাঁসটি আর ফুসটি ঃ

এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে বললে যে তার সঙ্গে ঐ ব্যক্তির কিছু প্রয়োজনীয় কথা আছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন প্রথম ব্যক্তিটির কাছে এগিয়ে এল। প্রথম ব্যক্তি যেন অতিশয় গোপন কিছু বলবে এই ভাবে দ্বিতীয় জনের কানে কানে কথাটি বলেছিল।

ধরেছে তরকারি আপনার গুণ ঃ

একজন ওলের খুব প্রশংসা শুনে ওল খেতে মনস্থ করল। ওলের তরকারি কিছুক্ষণ বেশ খেলে সে, কিছু হল না। তারপরই শুরু হল কুটকুট করা। বেচারী তখন আর কি করে ? মনে মনে যার মুখে ওলের প্রশংসা শুনে ওল খেতে প্রবৃত্ত হয়েছিল তাকে গালিগালাজ করতে লাগল। এই রকম সময়ে একজন লোকটিকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে তার কারণ জানতে চাইলে। তখনই লোকটি বলেছিল, 'ধরেছে তরকারি আপনার গুণ।'

ধরা পড়েছে জয় মিত্তির ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ, কলকাতার আহিরীটোলায় এক অতিশয় ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। এর নাম ছিল জয় মিত্র। কথিত আছে তিনি

তাঁর জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে যখন বায়ু সেবনে বের হতেন, তখন একখানি সংবাদপত্র খুলে পড়ার ভান করতেন। জয় মিত্র ছিলেন নিরক্ষর। ফলে অনেক সময়ই তিনি সংবাদপত্রের সোজা উল্টো বুঝতে না পেরে উল্টো ভাবেই সংবাদপত্র ধরতেন। তাঁকে এই ত্রুটির প্রতি আকৃষ্ট করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'ও রকম আরও অনেকেই আছে হে, কেবল ধরা পড়ে গেছে জয় মিত্তির।'

ধান নাই চাল নাই, আন্দিরাম মহাজন ঃ

আন্দিরাম নামে এক অতি সাধারণ লোক ছিল এক সময়ে বাঁকুড়াতে। সে দেখলে ধান চালের মহাজনীতে প্রচুর লাভ। তাই সে মহাজনী কারবার করবে বলে মনস্থ করলে। কিন্তু ধান চালের মহাজনী কারবারে প্রভূত মূলধনের প্রয়োজন। বলাবাহুল্য আন্দিরামের তা ছিল না। সে তখন অন্য এক মহাজনের কাছে গিয়ে তার সমস্যার কথা বললে। সেই মহাজনটি ছিল খুব চতুব। সে তৎক্ষণাৎ আন্দিরামকে সাহায্য করতে রাজি হল। বলে দিল আন্দিরামের কাছে যত খাতক আসবে, তাদের সে যেন তার কাছে পাঠিয়ে দেয়। সেই তাদের সব কিছু সরবরাহ করবে। আন্দিরাম মহা খুশী। সে সর্বত্র রটিয়ে দিল তার মহাজনী কারবারের কথা। আর দলে দলে খাতকেরা তার কাছে আসতে শুরু করল। মহাজনের পরামর্শমতো সেও তাদের সকলকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে লাগল। মহাজন নিজের নামে খাতকদের সঙ্গে ব্যবসা করতে লাগলো গোপনে। এদিকে আন্দিরাম ব্যাপারটি না বুঝে মহাজনের অহংকার বোধ করতে থাকল।

ধুমকে গরাম দেবতা ডরায় ঃ

এক শাশুড়ী তার পুত্রবধূকে বড় জ্বালা দিত। শাশুড়ীর জ্বালায় হতভাগিনী বধূটি পেটভরে খেতে পর্যন্ত পেত না। একদিন ক্ষুধার্ত

যন্ত্রণায় বধূটি এক হাঁড়ি ভাত চুরি করে নদীর তীরে নিয়ে গিয়ে হাজির হয়। তারপর মনের আনন্দে সেই ভাত খেয়ে ফেলে। এদিকে নিকটস্থ মন্দিরের এক দেবী বধূর এই আচরণ দেখে গালে হাত দিয়ে পাথর হয়ে যান। দেবীর এই অবস্থা দেখে সকলেই চিন্তিত। দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য নানাবিধ পূজার্চনা করা হল; কিন্তু কিছুতেই দেবীর গাল থেকে হাত ছাড়ান গেল না। এমন কি দেশের রাজা অমঙ্গল আশঙ্কায় কম্পিত হলেন। তিনি পুরস্কার ঘোষণা করলেন। নানা পণ্ডিত, গুণী এলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষে বধূটি দেবীর কাছে গিয়ে দিল রাম ধমক।

আমি খালাম আমার ভাত
ত-র ক্যানে গালে হাত ?
ছাড়বি ত ছাড় গালের হাত
নইল্যে মাইরবা জড়া লাথ।

এরপর আর কি দেবীর পক্ষে গালে হাত রাখা সম্ভব ? বধূটির ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে দেবী তাঁর গাল থেকে হাত সরিয়ে ফেললেন।

না চাইতে ছাতাটা পাই, চাইলে বুঝি ঘোড়াটা পাই :

একবার এক অশ্বারোহী মাঠের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিল। তার হাতে ছিল একটি ছাতা। ছাতা নিয়ে ঘোড়ায় চড়া কষ্টকর বলে ব্যক্তিটি এক কৃষককে ডেকে তার হাতের ছাতাটি দিয়ে দেয়। কৃষকটি ছাতাটি পেয়ে ভাবলে না চাইতেই যদি সে ছাতাটি পেয়ে থাকে, তবে চাইলে নির্ঘাত ঘোড়াটিই পেয়ে যাবে। এই ভেবে সে অশ্বারোহীর অনুগমন করতে থাকল। অশ্বারোহী তা দেখে ঘোড়া থামাল। কৃষককে অনুগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করে যখন তার ঘোড়া লাভের ইচ্ছার কথা জানতে পারল, তখন জোরে এক ঘা চাবুক মেরে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

নয় মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না :

এক বাবু ছিলেন। এক সময়ে তাঁর আর্থিক অবস্থা খুব ভাল

থাকলেও পরে অত্যধিক বিলাসিতায় তাঁর আর্থিক অনটন দেখা দেয়। কিন্তু বাবুটির পারিষদবর্গ বাবুটিকে সমানে নানাবিধ আমোদ প্রমোদের আয়োজন করতে প্ররোচিত করত।

শহরে রাধারাণী নামে এক অতি সুন্দরী নর্তকী ছিল। পারিষদবর্গ একদিন প্রস্তাব দিলে ঐ নর্তকীর আয়োজন করতে হবে। বাবুটিও প্রস্তাবে সম্মত হলেন। অতএব রাধারাণীর কাছে লোক প্রেরিত হল। রাধারাণী নৃত্যের প্রস্তাবে সম্মত হল, তবে একটি শর্তে—শর্তটি হল যে নৃত্যের দিন বাবুটিকে নয় মণ তেল পুড়িয়ে আলো জ্বালার ব্যবস্থা করতে হবে। আসলে রাধারাণী বাবুটির আর্থিক অবস্থার কথা জানত। তাই সে এই রকম প্রস্তাব দিয়েছিল। যাই হোক পারিষদবর্গ রাধারাণীর সম্মতির কথা জেনে হর্ষোৎফুল্ল হল। বাবুটি বললেন অদূর ভবিষ্যতে নয় মণ তেল পোড়াবার ব্যবস্থা করে রাধারাণীর নৃত্যের আয়োজন করা হবে। কিন্তু সেইসময় একজন স্পষ্টবাদী পারিষদ বলে উঠল, 'নয় মণ তেল ও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।'

নাকে হাত দিয়ে বলা ঃ

কোন এক পল্লীগ্রামে এক জমিদার ছিলেন। জমিদারটি ছিলেন অতিমাত্রায় কৃপণ। একটি পয়সাও তিনি বাজে খরচ করতেন না। এমন কি বাজে খরচের আশঙ্কায় তাঁর গৃহে উপযুক্ত পরিমাণে তামাক পর্যন্ত থাকত না। এদিকে জমিদারবাবুটি চাল চলনে খুবই বাবুগিরি দেখাতে অভ্যস্ত ছিলেন।

তাঁর বাড়ীতে কোন অতিথি উপস্থিত হলে তিনি খুব আপ্যায়ণ করতেন। অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি অন্ততঃপক্ষে মৌখিক কথাবার্তায় রাখতেন না।

চাকরদের নির্দেশ দিতেন পা ধোবার জল আনতে, তামাক সাজতে, জল খাবারের বন্দোবস্ত করতে। চাকরদের কিন্তু তাঁর আগে থেকে বলা ছিল তিনি যতই নির্দেশ দিন না কেন, চাকরেরা যেন সে সব

নির্দেশে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে। এমন কি ভীষণভাবে গালাগালি দিলেও না। তবে সেই সঙ্গে তাঁর বলা ছিল তিনি যদি নাকে হাত দিয়ে কোন নির্দেশ করেন, তবে তা যেন পালিত হয়।

এইভাবেই দিন যায়। একদিন জমিদারের বৈবাহিক তাঁর বাড়ীতে এসে উপস্থিত। জমিদার তাঁর ভৃত্যদের নির্দেশ দিতে লাগলেন জল দিতে; তামাক দিতে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। জমিদারের পূর্ব নির্দেশ মত ভৃত্যেরা কেবল 'যে আজ্ঞে" 'এই যে আনছি, এইসব বলে সময় কাটাতে লাগল। এদিকে জমিদারের সত্য সত্যই ইচ্ছা হয়েছিল বেয়াইমশাইকে আপ্যায়ণ করার। কিন্তু তিনি পূর্ব নির্দেশ বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই বারংবার নির্দেশ দেওয়া সত্বেও ভৃত্যেরা তা পালন না করায় ক্ষুব্ধ জমিদার অধৈর্য হ'য়ে হাতের কাছে যে ভৃত্যটিকে পেলেন, তাকে আচ্ছা করে মারলেন। মার খেয়ে ভৃত্যটি কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতেই সে বললে, তার কি অপরাধ। সে তো জমিদারবাবুর নির্দেশমতই আচরণ করেছে। জমিদারবাবু একবারও তো নাকে হাত দিয়ে কোন কিছু দেবার নির্দেশ দেন নি। তাই সেও কিছু আনে নি।

জমিদারের বৈবাহিকের আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। জমিদারবাবু বৈবাহিকের সামনে খুব অপদস্থ হলেন।

নষ্টাশ্ব দগ্ধ রথন্যায়ের বিস্তার ঃ

দুই ব্যক্তি রথে চড়ে এক বনে প্রবেশ করল। হঠাৎ সেই বনের দাবানলের কারণে একজনের রথ পুড়ে গেল, অবশিষ্ট থাকল তার ঘোড়া; অপরপক্ষে অন্য জনের অশ্ব পুড়ে মারা গেলেও রক্ষা পেল তার রথটি। এইভাবে রথহীন এবং অশ্বহীন অবস্থায় বনে অবস্থানকালে হঠাৎ একদিন দু'জনের সাক্ষাৎ ঘটল। তখন একের রথে অন্যের ঘোড়া সংযোজন করে দু'জনে সহজেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছায়।

নাচ কোঁদ বউ আমার হাতের আটকাল আছে ঃ

এক বউ কাঁটকী শাশুড়ী তার বৌদের পেট ভরে খেতে দিত না।

তার ছিল দু'খানি সরা—একটি মাপে বড়, অপরটি মাপে ছোট। বড়খানির মাপে নিজের ভাত নিত, আর ছোটটির মাপে বৌদের ভাতের পরিমাণ ঠিক করে দিত। একদিন শাশুড়ীর হাত থেকে ছোট সরাটি পড়ে ভেঙ্গে গেল। বৌয়েরা ত খুব খুশী। তাহলে এখন থেকে তারা বড়ো সরার মাপে ভাত পাবে। উল্লাসে তারা বলাবলি করতে থাকল, 'ছোট সরাখানি ভেঙ্গে গেছে বড়ো সরাখানি বাঁচে।' কিন্তু কোথা থেকে হঠাৎ নিষ্ঠুর শাশুড়ী তা শুনতে পেয়ে জানিয়ে দিল, 'নাচ কোঁদ বউ আমার হাতের আটকাল আছে।'

নিমুখা কুক্কুর কাঁটা খাওনের যম :

যে কুকুর ডাকে না তাকে বলা হয় 'নিমুখা।' এরা কেবল খায় দায় আর চুপ করে থাকে। এই ধরণের কুকুর বিপরীত ক্রমে আবার মাছের কাঁটা, মুরগী ছাগল প্রভৃতির অস্থি খেতে ভালবাসে। সেই জন্যই প্রবাদটির উৎপত্তি হয়েছে।

নিত্য চাষার ঝি, বেগুন ক্ষেত দেখে বলে এ আবার কি ?

নিত্য নামে এক চাষা ছিল। সৌভাগ্যের জোরে তার মেয়ের এক ধনী পরিবারে বিবাহ হয়। একদিন মেয়েটি তার শ্বশুর বাড়ীর অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে বাগানে বেড়াবার সময় একদিকে বেগুন হয়ে রয়েছে দেখতে পেলে। পাছে বেগুন চেনে বললে শ্বশুরবাড়ীতে তার সম্পর্কে অবাঞ্ছিত ধারণা গড়ে উঠে সেই ভয়ে সে না জানার ভান করে বেগুন দেখিয়ে সেগুলি কি তা জানতে চাইলে। তখন তার বড়মানুষী দেখে এক পরিচারিকা ছড়াটি বলেছিল।

নিরানব্বইয়ের ধাক্কা :

এক গ্রামে এক ছুতোর বাস করত। তার দৈনিক আয় ছিল এক

টাকা বা দেড়টাকা। ছুতোর তার আয়ের কিছুমাত্র সঞ্চয় না করে যত্র আয় তত্র ব্যয় করত। ছুতোরটির এক সুবর্ণ বণিক বন্ধু ছিল। ঐ বণিকের পুকুরে ছুতোরের স্ত্রী প্রতিদিন জল আনতে যেত এবং বণিক পত্নীর সঙ্গে তাদের ভোজনের পরিপাট্যের কথা বলত। কিন্তু বণিক পত্নী লজ্জায় তাদের শাকান্ন ভোজনের প্রসঙ্গে লজ্জায় কিছু বলত না। তবে বাড়ীতে ফিরে তার সঙ্গে বণিকের বিরোধ বাধত। বণিক পত্নীর বক্তব্য, ছুতোর রোজ আনে রোজ খায়, তাদের যদি আহারের পরিপাট্য থাকে, তবে তারা প্রভূত বিত্তের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শাকান্ন গ্রহণ করবে কেন।

স্ত্রীর পীড়নের সম্মুখীন হয়ে বণিক প্রতিকারের এক উপায় স্থির করল। একদিন সন্ধ্যার সময় ছুতোরের বাড়ী সে বেড়াতে গেল। আসার সময়ে সকলের অলক্ষ্যে সে একটি টাকার তোড়া ছুতোরের বিছানায় ফেলে রেখে এল।

বণিক চলে যাবার পর ছুতোর যখন টাকার তোড়াটি দেখতে পেলে তখন সে ভাবলে বোধহয় বণিক ভুল করে ওটি ফেলে গেছে। তখনই ছুতোর বণিকের বাড়ী টাকার তোড়াসহ হাজির হল। কিন্তু বণিক টাকার তোড়াটি তার নয় বলে ছুতোরকে ফেরৎ পাঠালে।

ছুতোর ঘরে ফিরে তোড়ার টাকা গুণে দেখলে তাতে মোট নিরানব্বইটি টাকা রয়েছে। তখন ছুতোর ভাবলে যে এ যাবৎ সে কিছুই সঞ্চয় করতে পারেনি। তাই ঈশ্বর করুণাপরবশ হয়ে তাকে টাকাগুলি দিয়েছেন। সে স্থির করলে প্রাপ্ত টাকার সঙ্গে একটি টাকা যোগ করে পুরো একশ টাকা করবে। পরদিন ছুতোর যা আয় করল, তা থেকে একটাকা সঞ্চয় করে বাকি পয়সায় কোন ক্রমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করল। এরপর থেকে সে একশ টাকাকে দুইশত টাকায় পরিণত করার জন্য মনস্থির করলে এবং নিয়মিত সঞ্চয়ে লেগে গেল। ক্রমে দুইশত টাকা পূর্ণ হলে সে চারশ টাকায় তা পরিণত করতে লেগে পড়ল। ছুতোরের ভোজনের পরিপাট্য গেল। বণিকের যে দশা, তারও এখন সেই দশা। বণিক ছুতোরের অবস্থার কথা শুনে একদিন হাসতে হাসতে বললে,

'ভাই এবারে আমাকে সেই নিরানব্বইটি টাকা ফেরৎ দাও।' ছুতোর তো অবাক। তখন বণিক আনুপূর্বিক সব ঘটনা বিবৃত করল। ছুতোর বণিকের টাকা ফেরৎ দিল বটে কিন্তু সঞ্চয়ের অভ্যাস সে ত্যাগ করতে পারল না। নিরানব্বইয়ের ধাক্কা সামলাতে তাকে আজীবন পরিশ্রম করে অনেক টাকা জমাতে হয়েছিল। এর থেকেই 'নিরানব্বইয়ের ধাক্কা' প্রবাদটির উৎপত্তি।

পটল তোলা ঃ

'পটল' বলতে এক্ষেত্রে চোখের পাতাকে বোঝান হয়েছে। মৃত্যুর সময়ে চোখের পাতা উল্টিয়ে যায়, তাই পটল তোলা অর্থে মৃত্যুকে বোঝায়।

পেঁয়াজও গেল, পয়জায়ও হলো ঃ

এক ব্যক্তি পেঁয়াজের ক্ষেতে ঢুকে পেঁয়াজ চুরি করছিল। এমন সময় ক্ষেতস্বামী এসে ব্যক্তিটিকে ধরে ফেলল। তারপর তার সংগৃহীত পেঁয়াজগুলি কেড়ে নিয়ে তাকে জুতো দিয়ে রীতিমত প্রহার করল। তখন ঐ ব্যক্তি মনের দুঃখে বলেছিল কথাটি।

পশ্চাৎ ঝন্‌ঝনায়তে ঃ

এক ব্রাহ্মণের গোয়াল ঘরের পাশে একটা অতসী গাছ হয়েছিল। গাছের চারা অবস্থাতেই ব্রাহ্মণ তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে প্রতিদিন যত্ন করে জলসেচন করতেন। ক্রমে গাছটি বড় হল এবং সোনার মত রঙের ফুলও ফুটল। ব্রাহ্মণের তো ফুল দেখে ভারী আহ্লাদ। তার ধারণা হল, যে গাছে এমন সুন্দর ফুল হয়, না জানি সে গাছের ফল কত সুন্দর হবে। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা করে রইলেন অতসীগাছের ফল পাকলে তা থেকে তার রত্নলাভ হবে। কিন্তু ব্রাহ্মণের সে আশা আর মিটল

না। কেননা ফলগুলি পাকলে বৈশাখের বাতাসে সুঁটীর মধ্যে যখন সন্ সন্ করে শব্দ সৃষ্টি করল, তখনই ব্রাহ্মণের মোহভঙ্গ হ'ল এবং ব্রাহ্মণ বললেন :

সুবর্ণ সদৃশং পুষ্পং ফলে রত্নং ভবিষ্যতি
আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ পশ্চাৎ ঝন্‌ঝনায়তে।

পরের চাউল পরের ডাইল
নদে করের বিয়ে।

নবদ্বীপ বা নদে বলে এক ব্যক্তি এক গৃহস্থের পরিবারে ভৃত্যের কাজ করত। তার নিজস্ব বলে কিছুই ছিল না, না ছিল জায়গা জমি, না ছিল ঘর দোর। যাই হোক, এ হেন নবদ্বীপ চন্দ্রেরও যথারীতি বিবাহের সম্বন্ধ হল। গৃহস্থ বললে সে নদের বিবাহের সব দায়িত্ব বহন করবে। নবদ্বীপ তো মহাখুশী। সে তার বিবাহে পরিচিত-অপরিচিত আত্মীয়-অনাত্মীয় অনেককেই নিমন্ত্রণ করলে। বেচারী গৃহস্থ আর কি করে, কথামত সব অতিথিকেই ভালভাবে আপ্যায়ণ করলে। আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা ভোজনের প্রশংসা করতে থাকলে এক প্রতিবেশী ছড়াটি বলেছিল।

"পি পু", "ফি শু" :

দু'জন অলস ব্যক্তি ছিল। এদের মত অলস বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে খুঁজে পাওয়া ভার ছিল। একদিন দু'জনে একটি কুঁড়ে ঘরে শুয়ে ছিল। বরাতের ফেরে সেই কুঁড়েতে আগুন লাগে। আগুনের তাপ একজনের পিঠে এসে লাগল। সে কোথায় পত্রপাঠ উঠে পড়ে আত্মরক্ষা করবে তা না করে বললে 'পি পু', অর্থাৎ 'পিঠ পুড়ে যাচ্ছে' কথাটি বলার মতও ক্ষমতা তার হল না, সংক্ষেপে জানাল 'পি পু'। সঙ্গীটিও তেমনি অলস। সেও সংক্ষেপে জবাব দিল 'ফি শু', অর্থাৎ 'ফিরে শো।'

পান পান্তা ভক্ষণ, এই তো পুরুষের লক্ষণ
আমি অভাগী তপ্ত খাই, কোন দিন বা মরে যাই।

এক ছিল কৃষক। সে যেমন ভালমানুষ, তার বউটি তেমনি চালাক এবং স্বার্থপর। সে করত কি কৃষককে নিত্য দিন পান্তা ভাত খেতে দিত। আর নিজে খেত গরম ভাত। একদিন তার এই আচরণের কারণ জানতে চাইল এক প্রতিবেশিনী। তখন কৃষকপত্নী বললে যে, পুরুষ মানুষের প্রিয় হল পান এবং পান্তা। তাছাড়া এই দুইয়ের সঙ্গে পৌরুষের ভাব যুক্ত আছে। সেই কারণেই সে কৃষককে নিত্য দিন পান্তা খেতে দেয়। আর সে নিজে এমনই হতভাগিনী, যে গরম ভাত খেয়ে মরে। এই গরম ভাত খেয়েই হঠাৎ করে একদিন সে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়বে। ভাবটা এমন যেন পান্তা খেলেই সে দীর্ঘজীবী হত। স্বামীকে তার ভালর জন্যই সে নিত্যদিন পান্তা খেতে দেয় নিজেকে বঞ্চিত করে।

পাগলা সাঁকো নাড়িস নে
মনে ছিল না, ভাল মনে করে দিলি।

এক পাগলা একটি হাল্কা বাঁশের সাঁকোর কাছে থাকত। যখনই কেউ বাঁশের সাঁকো ধরে পার হ'ত, তখনই সে সাঁকোটি ধরে খুব কষে নাড়াত। স্বভাবতঃই সাঁকোর সাহায্যে অতিক্রমকারী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত। এতেই পাগলটি মজা বোধ করত।

একদিন এক ব্যক্তি সাঁকো ধরে পার হবে। দেখলে পাগলটি কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হয়ে সাঁকোর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যক্তিটি ভাবলে আগে থেকে পাগলকে নিষেধ না করে দিলে পার হবার সময় সাঁকো নাড়লে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। অতএব সেই ব্যক্তি পাগলকে সাঁকো যাতে না নাড়ে সেজন্যে বললে। এখন যে কোন কারণেই হোক, পাগলটি সাঁকো নাড়ার কথা ভুলেছিল। নিষেধ করায়

তার সাঁকো নাড়ার কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে সাঁকো নাড়াবার জন্য প্রস্তুত হল।

পাগলে আর মজা নাই, পীরিতে আর সুখ নাই ঃ

একজন লোক সত্যিকারের পাগল না হয়েও পাগলের ভান করে নানাজনের ওপর সময়ে অসময়ে নানা ধরণের অবাঞ্ছিত আচরণ করত। লোকে তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে শেষে তাকে উত্তম মধ্যম দিলে সে পাগলামির ভান ত্যাগ করে স্বাভাবিক আচরণ করতে বাধ্য হল।

অপরপক্ষে আর এক ব্যক্তি ছিল যার দুর্বলতা ছিল নারীর প্রতি। সুযোগ পেলেই সে নারী সান্নিধ্য ভোগ করত এবং কয়েকজন নারীর সর্বনাশও সে করেছিল। শেষে সে ধরা পড়ে বেধড়ক প্রহার লাভ করল। সে ও অতঃপর তার বদভ্যাস ত্যাগ করল। একদিন আগের পাগলের সঙ্গে তার দেখা হ'ল। পরস্পর পরস্পরের খবর জানতে চাইল। প্রথম জন তখন দ্বিতীয় জনকে বললে, 'পাগলে আর মজা নাই।' দ্বিতীয় জন প্রথম জনকে বললে, 'পীরিতে আর সুখ নাই।'

ফুটো বেটার ফুটুনি,
ফল বিয়েতে রয়ানি।

বর্তমান বাংলা দেশের বরিশাল জেলার কলসকাঠী-খয়েরাবাদ-বাখরগঞ্জ অঞ্চলে সুপ্রচলিত এক পল্লীকেন্দ্রিক আনন্দানুষ্ঠান হল রয়ানি। এতদঞ্চলের পরিবারের বৃদ্ধা ঠাকুমারা প্রিয়জনের কল্যাণ বা আরোগ্য কামনায় রয়ানি গানের মানৎ করতেন কখনও পাঁচ দিনের, কখনও বা সাত দিনের। এর থেকেই প্রবাদটির উৎপত্তি।

আগেকার কালে গৌরী দান প্রথা প্রচলিত ছিল। অল্প বয়স্কা পাত্রীকে পাত্রস্থ করলেও কন্যাকে পিতৃগৃহেই রেখে দেওয়া হ'ত।

অবশ্যই এর মেয়াদ ছিল নির্দিষ্ট। কন্যা প্রথম ঋতুমতী না হওয়া পর্যন্ত পিতৃগৃহে অবস্থান করত। ঋতুমতী হ'লে স্বামীকে উপস্থিত হ'য়ে ফল-মূলাদি দান সহ কিছু স্ত্রী আচার সহ পূজা পার্বণে অংশ গ্রহণ করতে হ'ত। পরিবারে এটি আনন্দানুষ্ঠান বলেই বিবেচিত হ'ত। সম্ভবত 'বাড়াবাড়ি' অর্থে রয়ানির কথা প্রবাদটিতে ব্যবহৃত।

ফুললো আর মলো ঃ

দুই বন্ধু ছিল, একজন ছিল রাম বোকা আর একজন ছিল রাম চালাক। একদিন বোকা বন্ধু একটি কাঁঠাল কিনল। ঠিক হ'ল দুই বন্ধুতে কাঁঠালটি খাবে। চালাক বন্ধু চাইল কাঁঠালটির বেশির ভাগ সেই খাবে। তাই সে এক মতলব করল। খাওয়ার শুরুতেই সে বোকাকে বললে, 'তোর মা কি করে মারা গেল রে ?'

আর যায় কোথা, বোকা শুরু করল তার কাহিনী। সবিস্তারে সে তার মা'র অসুখ, চিকিৎসা প্রভৃতির কথা বলতে লাগল। আর এই অবসরে চালাক বন্ধু দিব্বি কাঁঠাল খেয়ে চলল। যখন বোকার বৃত্তান্ত শেষ হল, তখন চালাক বন্ধুর কাঁঠাল খাওয়া শেষ।

বোকা ঠিক করল সে ও এর প্রতিশোধ নেবে। আর একদিন চালাক বন্ধুর টাকায় কেনা হল কাঁঠাল। বোকা চালাক বন্ধুকে বললে, 'হ্যাঁ রে, তা তোর মা কিভাবে মারা গেল বল দেখি শুনি।' চালাক বুঝতে পারলে বোকা তার বুদ্ধি তার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেছে। পাছে সময় নষ্ট হয় এইজন্য সে বললে, 'ফুললো আর মলো।' বেচারী বোকা বন্ধুর আর চালাকি খাটল না।

ব্যাঙের আধুলি ঃ

একটি ব্যাঙ একবার একটা আধুলি পেয়েছিল। আধুলিটি পেয়ে সে ত খুব অহংকারী হয়ে পড়ল। ভাবলে তার মত বিত্তবান আর

কেউ নেই। সে সেই আধুলিটার ওপর সদা সর্বদা বসে থাকত, আর যখনই কেউ তার সামনে দিয়ে যেত, তাকেই সে লাথি দেখাত।

একদিন এক পথিক এইভাবে লাথি দেখে খুব রুষ্ট হল। সে এর কারণ অনুসন্ধান করে সব ব্যাপারটিই জানতে পারল। সে মনে মনে ব্যাঙকে উচিত শিক্ষা দেবার কথা ভাবলে। ব্যাঙটি যখন নিদ্রিত ছিল, তখন পথিক তার আধুলিটি চুরি করে নিয়ে চলে গেল। ব্যাঙ যখন দেখলে তার আধুলিটি নেই, তখন সে তার আগের অভ্যাস ত্যাগ করল।

বিসমিল্লায় গলদ ঃ

একজন ফকির প্রতিদিন সকালে ভিক্ষা করতে বের হত। আর সন্ধ্যাবেলা নাগাদ তার কুটীরে ফিরত। তার সাত আটজন চেলা ছিল। ফকির তাদের সকলকে খাইয়ে তারপর নিজে খেতে বসত।

একদিন তার একজন চেলা ফকিরকে বলল, 'আপনি এত কষ্ট করে ভিক্ষা করেন কেন?' আমাদের বাদশা দয়ালু, ধর্মভীরু এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী। আপনি যদি একটা কাজ করেন, তাহলে আমাদের দারিদ্র্য ঘোচে, আমরা ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিষ্কৃতি পাই।' ফকির চেলাটির কাছে এই কথা শুনে উপায়টি কি সেই সম্পর্কে জানতে চাইলে।

তখন চেলাটির পরামর্শমত ঠিক হল ফকির এক নিবিড় অরণ্যে গিয়ে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের ত্বকে ছুরি দিয়ে অঙ্কিত করে আসবে যে, অমুক স্থানে অমুক ফকির আছে, সেই ফকিরকে বাদশা যদি দু'লক্ষ আসরফি দেন, তাহলে বাদশার মঙ্গল, নতুবা তাঁর অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

ফকির সেইমত লিখে আসার পর গৃহে বসে রইল। এদিকে প্রতিদিন এক একটি চেলা বাদশার প্রাসাদে দর্শন দিত। বাদশাও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে কিছু কিছু ভিক্ষা দিতেন। এক চেলা এসে বাদশাকে অভিবাদন করে বললে, 'খোদাবন্দ! গত রাত্রে আমি এক স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে দেখেছি যে আপনার রাজ্যের আয় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে স্বপ্নে কাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে বাদশার এমন আয় বৃদ্ধি কেমন করে

হ'ল তা মনে নেই। তবে সেই ব্যক্তি বললে বাদশা অমুক বনস্থিত একটি বৃক্ষে অঙ্কিত ঈশ্বরের আদেশ পাঠ করে এমন ঐশ্বর্যশালী হয়েছেন।' এই কথা বলে চেলাটি চলে গেল। বাদশা তখন সেই অরণ্যে লোক পাঠালেন সত্য সত্যই সেখানে কোন বৃক্ষে ঈশ্বরের কোন নির্দেশ অঙ্কিত হয়েছে কি না তা যাচাই করতে।

বহু অন্বেষণে তাঁর প্রেরিত লোক বৃক্ষটির সন্ধান পেল। সে ফিরে এসে বাদশাকে জানাল যে বাস্তবিকই আল্লাতালার নির্দেশ একটি বৃক্ষে অঙ্কিত আছে। নির্দেশটি হ'ল—বাদশা যেন অমুক ফকিরকে দু'লক্ষ আসরফি দেন।

বাদশা কোষ থেকে দু'লক্ষ আসরফি দানের হুকুম দিতে যাবেন, এমন সময় উজীর বাধা দিয়ে বললেন যে বাদশা এবং তিনি নিজে লেখা না দেখে অর্থ দেবেন না।

সেইমত বাদশা ও উজীর অরণ্য মধ্যে গেলেন এবং বৃক্ষ ত্বকে লিখিত নির্দেশটি পাঠ করলেন। উজীর বললেন, 'গলতসৎ বিস্‌মল্লা' অর্থাৎ বিস্‌মল্লায় গলদ।

বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

উজীর বললেন, 'মানুষ কিছু লেখার সময় প্রথমেই বিস্‌মল্লা প্রভৃতি লিখে থাকে, কিন্তু আল্লাতালা নিজে যখন লিখবেন, তিনি কেন আল্লা লিখতে যাবেন?'

ক্রমে ফকির ও তার চেলাদের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেল। বাদশার আদেশে ফকিরের প্রতি শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা হল।

বামনা শীত ঃ

এক ব্রাহ্মণ ছিল, ব্রাহ্মণটির কোন শীতবস্ত্র ছিল না। তাই বেচারীকে সারাটা শীতকাল শীতবস্ত্রহীন অবস্থাতেই কাটাতে হ'ল। ক্রমে চৈত্র মাস পড়ল, ব্রাহ্মণ দেখলে তখনও শীত রয়েছে। অগত্যা সে তার একমাত্র সম্বল দুগ্ধবতী গাভীটিকে বিক্রয় ক'রে একটি কম্বল কিনলে। সেই থেকে চৈত্রমাসের শেষ কয়দিনের শীতকে বলা হয় 'বামনা শীত'।

বাপে দিছে শ, মায়ে দিছে পঞ্চাশ,
অভাগ্যা মুখে বলে জুতা নিছে হিঙ্গলে।

মুখরা কন্যা পাছে বিবাহ বাসরে অথবা ছাতনা তলাতেও কথা বলে পাত্র পক্ষীয়ের বিরাগ ভাজন হয় সেই ভয়ে তার মা বাবা মেয়েকে অন্ততঃ পক্ষে বিবাহ কালে যাতে সে কথা না বলে সেজন্যে অনেক করে অনুরোধ করেন। শুধু তাই নয় কথা বলবেনা এই কড়ারে পিতা মেয়েটিকে একশ টাকা এবং তার মাতা তাকে পঞ্চাশটি টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ মেয়েটি দেখে বরযাত্রীর জুতো নিয়ে কুকুর পালাচ্ছে। সেই দেখেই সে হঠাৎ কথা বলে ওঠে।

'টুনী কথা কস্‌নে, টুনী কথা কসনে'—এটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাহিনীর সঙ্গে এই প্রবাদটির গভীর সাদৃশ্য বিদ্যমান।

বাংগালীর পুত আরবী কয়।
আব আব করইয়া মরণ অয়॥

কোন এক বাঙ্গালী সন্তান আরবী ফারসীতে মহাপণ্ডিত হয়ে বাড়ী ফিরল। সে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আরবী কথা বলে তার পাণ্ডিত্যের জাহির করত। একদিন পিপাসায় কাতর হয়ে সে চীৎকার করতে থাকল, 'আব আব।' 'আব' শব্দের অর্থ হল জল। বাঙ্গালী সন্তানের কথার অর্থ কেউই বুঝল না। বেচারীকে শেষ পর্যন্ত পিপাসায় প্রাণ ত্যাগ করতে হল।

বিষস্য বিষমৌষধম্‌ঃ

একবার কবি কালিদাস উজ্জয়িনীর রাজপথ দিয়ে যেতে যেতে পথ পার্শ্বস্থিত একটি দ্বিতল প্রাসাদে দৃষ্টি পড়লে দেখতে পেলেন প্রাসাদ শিখরে একটি অনবগুণ্ঠিতা ষোড়শী দাঁড়িয়ে আছে। অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি। কালিদাস তো তার থেকে চোখ ফেরাতে পারেন না, বারংবার মেয়েটিকে দেখতে লাগলেন।

ষোড়শীটি কালিদাসের তাকানো দেখে লজ্জিত হ'য়ে আত্মগোপন করল। এদিকে তার অদর্শনে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে কালিদাস অস্থির আবেগে বলে উঠলেন :

দৃষ্টিং দেহী পুনর্বালে কমলয়াত লোচনে,
শ্রুয়তেহি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধম্।

বললে মা মার খায়, না বললে বাপে এঁটো খায় :

কোন কোপন স্বভাব বিশিষ্ট এক ভদ্রলোক ছিল অতিশয় মাংসপ্রিয়। একদিন লোকটি ছাগলের খানিকটা মাংস কিনে এনে তার স্ত্রীকে রাঁধতে বলল। লোকটি এরপর কাজে বেরিয়ে গেল। গৃহিণী স্বামীর কথামত মাংস রেঁধে রান্নাঘরে একটি পাত্রে ঢেকে রাখল। কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে রান্না ঘরে একটা কুকুর ঢুকে পাত্রে রাখা মাংসের অনেকটাই খেয়ে ফেলল।

গৃহিণী টের পেয়ে তাড়াতাড়ি কুকুরটাকে মেরে তাড়িয়ে দিল। কিন্তু স্বামী এসে কি বলবে এই ভয়ে সে কাঁপতে লাগল। কোন উপায় না দেখে সে নিষ্ঠুর স্বামীর অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় কুকুরের খাওয়া মাংসই স্বামীকে খেতে দিল। ভদ্রলোক মাংসের পরিমাণ কম হওয়ার কারণ জানতে চাইল। গৃহিণী বললে যে ছেলেরা মাংস খেয়েছে। কর্তাটি আর কোন উচ্চবাচ্য করল না। কিন্তু তাদের একটি বুদ্ধিমতী কন্যা ছিল। সেই মেয়েটি প্রথম থেকে সব কিছুই জানত। পিতা-মাতার কথোপকথন শুনে সে মনে মনে ভাবতে লাগল, এখন কি করা উচিত। কুকুরের মাংস খাওয়ার ব্যাপারটা প্রকাশ করলেও বিপদ, প্রকাশ না করাও অন্যায়। সে ভাবলে, 'বললে মা মার খায় না বললে বাপে এঁটো খায়।'

বাঘার লে হাগার ভয়, হাগার লে টিপটিপির :

বনের ধারে বাস একটি পরিবারের। স্বভাবতঃই তাদের বাঘের ভয়

খুব। যে কোন সময়ে বিশেষত রাত-বিরেতে বাড়ী থেকে বের হওয়া চলে না। কি জানি কখন বাঘের মুখে পড়তে হয়।

একদিন পরিবারের একটি শিশুর খুব পায়খানা পেয়েছে। কিছুতেই আর থাকতে পারছে না। মা-কে পায়খানা পাবার কথা বলতে মা বললেন, 'টিপটিপি আছেন।' অর্থাৎ টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আসলে মা ভোর না হওয়া পর্যন্ত শিশুটিকে বাড়ীর বের হতে দিতে নারাজ। এদিকে কাছাকাছি ছিল বাঘ। সে ভাবলে, সত্যিই টিপটিপ বলে কোন ভয়ানক জন্তু বোধহয় আছে। আর যায় কোথা। বাঘ সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে চম্পট দিল।

বন্ধু রোগইত ঐ ঃ

এক ব্রাহ্মণের আপনার জন বলতে কেউ ছিল না, ছিল কেবল একটি গাভী। ব্রাহ্মণ গাভীটিকে বড় ভালবাসত। এক প্রয়োজনে ব্রাহ্মণকে কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে যেতে হয়েছিল। ব্রাহ্মণ তখন গরুটিকে তার এক বন্ধুর হেফাজতে রেখে গেল। বন্ধুটি দুগ্ধবতী গাভীটির প্রতি তার লোভ সংবরণ করতে পারলে না। সে এটিকে আত্মসাৎ করবে বলে ঠিক করল। কিছুদিনের জন্য সে গাভীটিকে অন্যত্র সরিয়ে দিল।

এদিকে কয়দিন পরে ব্রাহ্মণ ফিরল। ফিরেই সে হাজির হল বন্ধুর কাছে গাভীটি নিতে। কিন্তু বন্ধুটি শোনাল তাকে দুঃসংবাদ। ব্রাহ্মণের গাভীটি কয়দিন হল মারা গেছে। ব্রাহ্মণের ত মাথায় হাত। যাই হোক ব্রাহ্মণ গরুটির কি হয়েছিল, তার মৃতদেহ কোথায় ফেলা হয়েছে—এইসব জানতে চাইল।

বন্ধুটি ব্রাহ্মণের এইসব প্রশ্নে মনে মনে হাসল, তবে মুখে কিছু বললে না। সে ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হল গ্রামের প্রান্তে। সেখানে একটি ঘোড়ার কঙ্কাল পড়েছিল। বন্ধুটি সেটি দেখিয়ে বেমালুম বলে দিল, ওটিই ব্রাহ্মণের গরুর কঙ্কাল। ব্রাহ্মণ সাশ্রুনয়নে কঙ্কালটি দেখলে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল কঙ্কালের মুখের দু'পাটি দাঁতে।

ব্রাহ্মণ বললে ওটি কোনমতেই তার গাভীর কঙ্কাল হতে পারে না।

কিন্তু বন্ধুটিও দমবার পাত্র নয়। সে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাহায্যে বললে একটা কথা তার ব্রাহ্মণকে বলা হয়নি। তা হল গরুটির হঠাৎ করে ওপর পাটির দাঁত বেরুল, আর তাতেই তার মৃত্যু হল—ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করে বন্ধুটি বললে, 'বন্ধু রোগই ত ঐ।'

বিপদে রাম নাম ঃ

এক রাজা ছিলেন। রাজাটি ছিলেন বড়ই অবিবেচক। তাঁর একটি বড় দোষ ছিল এই যে মনের মধ্যে যখনই কোন খেয়াল হত, সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যে পরিণত করতে ব্যাকুল হয়ে উঠতেন।

একদিন রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট থাকাকালীন তিনি বলে উঠলেন, 'এই কুকুরটিকে আমি বড় ভালবাসি।'

কিন্তু রাজার দুঃখ কুকুরটি যে কথা বলতে পারে না। রাজা এজন্য রাজ বৈদ্যকেই দায়ী করলেন। নির্দেশ দিলেন যেমন করেই হোক কুকুরটির বাকশক্তির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। চোদ্দদিনের মধ্যে কুকুরটিকে কথা বলাতে না পারলে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে বলে রাজা জানালেন।

বৈদ্য জোড়হাতে বললেন কুকুরের রোগটি পুরুষানুক্রমিক। তাই মাত্র চোদ্দ দিনে তার নিরাময় হওয়া অসম্ভব। তিনি রাজার কাছে নিরাময়ের জন্য চোদ্দ বৎসর সময় প্রার্থনা করলেন। রাজা সম্মত হলেন।

রাজবৈদ্য এরপর কুকুরটিকে স্নান করিয়ে তার মাথায় একটু তুলসী পাতার রস দিয়ে ঠাকুর ঘরের বাইরে বেঁধে নিজে স্নান আহ্নিক সেরে শুচি হয়ে দৈনিক আধ ঘন্টাকাল চোখ বুঝে পাখী পড়ানোর মত কুকুরটির কাছে 'জয় সীতারাম' বলতে লাগলেন। বৈদ্যের এক বন্ধু বৈদ্যকে বললেন যে তাঁর রাজামশায়ের কাছ থেকে সময় বাড়িয়ে নিয়ে কি লাভ। কারণ কুকুর কোনদিনও কথা বলতে পারবে না। বৈদ্য তখন বললেন

যে এতদিন কাতরভাবে রামচন্দ্রের মূর্তিখানি মনে করে—, তাঁর নাম উচ্চারণ করার পরে যদি প্রাণদণ্ড হয়ই তাতে তাঁর কোন দুঃখ নেই। প্রথমতঃ চোদ্দ বৎসরের মধ্যে তাঁর নিজের কুকুরটির অথবা রাজার কারুর না কারুর মৃত্যু হবেই। একজনের মৃত্যু হলেই হাঙ্গামা চুকে যাবে। তাছাড়া এই কুকুরটির মৃত্যুর পর যদি রাজা অন্য একটি কুকুর দেন, সেক্ষেত্রেও তিনি চোদ্দ বৎসর সময় নেবেন। এরপর বৈদ্য বললেন ঃ

বলিতে বলাতে রাম,
পাব আমি অবিরাম।
হেন মোর ভাগ্য হবে,
কেবা জেনে ছিল কবে?
তাতে যদি যায় প্রাণ,
নাম-গুণে পরিত্রাণ।
ধন্য আমি ধন্য ধাম,
বিপদেতে রাম নাম।

বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর ঃ

এক ছিল ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের ছিল চাষের জমি। ব্রাহ্মণ নিজে চাষ করত না বটে, তবে জন খাটিয়ে নিজের জমিতে ফসল ফলাত। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন চাষের জমিতে উপস্থিত থেকে কৃষিকার্যের তদারকি করত। বলাবাহুল্য কাজের লোকেরা যে পর্যন্ত ব্রাহ্মণ স্বয়ং হাজির থাকত, সে পর্যন্ত আর কাজে ফাঁকি দিত না। কিন্তু ব্রাহ্মণ তো আর সারাটাক্ষণ চাষের মাঠে হাজির থাকতে পারত না। তার স্নান পূজা আহ্নিক খাওয়া দাওয়া সবই ছিল। তাই এইসব কারণে ব্রাহ্মণ যেই চাষের জমি ছেড়ে নিজের বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হত, অমনি তার নিযুক্ত জনেরা শুরু করত কাজে ফাঁকি দিতে। তারা লাঙ্গল গভীর ভাবে চেপে চাষ করত না।

বাঁউনের রঁাড়ে কাকর মোলাম্ঃ

এক কথক ঠাকুর গাঁ শুদ্ধ মেয়েছেলেদের কাছে নরকের বিবরণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, পরপুরুষের সঙ্গ করলে ভীষণ পাপ হয়। এই পাপের শাস্তি কি রকম তা বোঝাতে গিয়ে তিনি বললেন যে অসতী স্ত্রীলোকদের যমদূতেরা কাপড়-চোপড় খুলে নিয়ে মাথার লম্বা চুল ধরে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে কাঁকরের ওপর দিয়ে নিয়ে যায়। এ বিবরণ শুনে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ সকলেই ভয়ঙ্কর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সকলেই ভাবতে লাগল, তাদের কপালে কি আছে কে জানে, কোন অসতর্ক মুহূর্তে পরপুরুষের দিকে কখন হয়ত তাকিয়ে থাকতে পারে।

ঐ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ছিল কথক ঠাকুরেরই রক্ষিতা এক স্ত্রীলোক। রাত্রিবেলায় কথক ঠাকুর তার দরজায় গিয়ে আস্তে আস্তে যেই টোকা মেরেছেন, অমনি সেই মেয়েটি তার ঘরের ভেতর থেকেই বললে, না বাপু ঢের হয়েছে, আর আমি উপপতির মধ্যে নেই। উদোম গায়ে কাঁকরের উপর দিয়ে হ্যাঁচড়ানো আমার সইবে না।

কথক ঠাকুর দেখলেন ব্যাপার বেগতিক। তিনি নিজেই নিজের সর্বনাশ করে বসে আছেন। যাই হোক তাড়াতাড়ি তিনি তাঁর রক্ষিতা স্ত্রীলোকটিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তোর কোনই ভয় নেই। তুই হলি বাঁউনের রঁাড়। তোর বেলা তোর নাগরের—মানে আমার ব্রহ্মতেজে কাঁকর সব মোলাম হয়ে যাবে। এখন তুই দরজা খোল দিকিনি।'

ভট্টাচার্যের পত্র আড়াল ঃ

একজন সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের পাশে বসে আহার্য গ্রহণ করলে তার বিরুদ্ধে কি ধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় সেই সম্পর্কে এক বিচক্ষণ ভট্টাচার্যের কাছে জানতে এসেছিল। বলাবাহুল্য যে মানুষটির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, সে ছিল উচ্চবংশজাত। এই ব্যক্তি পূর্বেই ভট্টাচার্যের কাছে এসে তাকে

কিছু উপঢৌকন দিয়ে হাত করে নিয়েছিল। তাই ভট্টাচার্যের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান নিতে এলে তিনি বলে দেন যে উচ্চবংশীয়ের কোনই ত্রুটি হয় নি। কারণ তথাকথিত অন্ত্যজ মানুষটি এবং উচ্চবংশীয়ের মানুষটি পাশাপাশি বসে আহার করলেও উভয়ের মধ্যে পত্রের (কলপাতার) আড়াল ছিল।

ভাত খাই কাঁসি বাজাই রগড়ের ধার ধারি না ঃ

এক ব্যক্তি কবির দলে কাঁসি বাজাত। এর বিনিময়ে কবিওয়ালা তাকে দু'বেলা আহার্য্য দিত।

একদিন এক জায়গায় কবিগানের পর একজন কাঁসিওয়ালাকে বললে, আগের দিন নাকি ঢুলির সঙ্গে গায়েনের খুব রগড় বেধেছিল? উত্তরে কাঁসিওয়ালা বললে যে এসবের কিছুই জানে না, 'ভাত খাই কাঁসি বাজাই রগড়ের ধার ধারি না।'

ভাত কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটার গোঁসাই ঃ

এক ছিল অলস প্রকৃতির লোক। কোন কাজকর্ম করত না। রোজগার পাতিও তার ছিল না কিছুই। সে শুধু খেত আর ঘুমাত আর একটু ছুতো পেলেই স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করত। ওদিকে অকর্মন্য স্বামীর সংসার প্রতিপালনের জন্য বেচারী স্ত্রীকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হত। সে অন্যের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করত। একদিন স্বামী তার কোন খুঁত পেয়ে নাক কাটতে উদ্যত হলে স্ত্রীটি ক্ষুব্ধ হ'য়ে কথাটি বলেছিল।

ভবি ভোলবার নয় ঃ

ভবি বা ভবানী নামে একটি বালিকা তার মাতা-পিতার কাছে অন্যায় আবদার করেছিল। তাঁরা ভবিকে ভোলাবার জন্য নানাভাবে

চেষ্টা করলেন, নানা রকমের জিনিসও দিলেন। এমনকি শেষ-পর্যন্ত প্রহার করলেন। তবু সে নিজের জেদ ছাড়ল না। জেদে অটল থেকে সে বললে, 'তোমরা যাই দাও, যাই কর, ভবি ভোলবার নয়।' এই থেকেই প্রবাদটির উৎপত্তি।

ভূতের বাপের ছেরাদ্দ ঃ

একবার সব ভূতে মিলে ঠিক করলে মানুষ যেমন তাদের বাপ মারা গেলে বাপের শ্রাদ্ধ করে, তেমনি তারাও তাদের বাপের শ্রাদ্ধ করবে। সিদ্ধান্তমত একটি মাঠে শ্রাদ্ধের আয়োজন করল তারা। এখন শ্রাদ্ধের জোগাড় হলেই ত আর হবে না, শ্রাদ্ধ করাতে পুরোহিত চাই। ভূতেরা যখন পুরোহিতের সন্ধানরত, এমন সময় এক ভট্টচায্যি ব্রাহ্মণ ঐ মাঠের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। ভূতেরা তাকে ধরলে তাদের বাপের শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য করতে হবে। ব্রাহ্মণের ত অবস্থা কাহিল। এরকম বিপদে কখনও পড়তে হবে তা তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। যাই হোক ভূতেদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ মাঠের মধ্যে গিয়ে হাজির হল। তারপর বললে শ্রাদ্ধ করতে গেলে পিতার নামের প্রয়োজন। তা কার শ্রাদ্ধ হবে?

সঙ্গে সঙ্গে সব ভূত চীৎকার করে উঠল, 'আমার বাবার শ্রাদ্ধ হবে।' ব্রাহ্মণ বললে একসঙ্গে সকলের বাবার ত শ্রাদ্ধ করা যাবে না, এক এক করে করতে হবে।

সব ভূতই চীৎকার করে উঠল, 'আমার বাবার শ্রাদ্ধ আগে হবে।'

পুরোহিত তখন প্রস্তাব করলে প্রধান ভূত যে তার বাবার শ্রাদ্ধটাই সকলের আগে করা যাক। সঙ্গে সঙ্গে ভূতেদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল বিরোধ—কে প্রধান। সকলেই নিজেকে প্রধান বলে দাবী করতে লাগল। এইরকম যখন চরম বিশৃঙ্খলা চলছে সেই সুযোগে ব্রাহ্মণ সেই স্থান থেকে পালিয়ে বাঁচলে।

ভীম একাদশী ঃ

এক সেকেলে জমিদারের একটি স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন ভৃত্য ছিল।

ভৃত্যটির নিজের বুদ্ধি সম্পর্কে কিন্তু দেমাক ছিল ষোল আনা।

জমিদারটি ছিলেন একজন গোঁড়া হিন্দু। অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে তিনি বেশ জাঁকজমক করে একাদশী করতেন। নির্জলা একাদশী তাঁর সহ্য হত না। তিনি সারাটা দিন উপবাসে কাটিয়ে অপরাহ্ণে লুচি, কচুরি, সর, দুধ, ক্ষীর, ছানা ইত্যাদি আহার্য্য গ্রহণ করতেন।

চাকরটি মনিবের একাদশীর খাওয়া দেখে খুব প্রলুব্ধ হল। সেও মনে মনে ভাবলে একাদশী করবে। কিন্তু আগে থেকে সে মনিবকে কিছুই জানালে না। ভাবটা, একেবারে একাদশীর দিন মনিবকে চমকে দেবে।

যথারীতি একাদশীর দিন এসে গেল। ভৃত্যটি অন্যদিন দিনে তিনবার ভাত খেত, তাছাড়াও চাল ভাজা, মুড়ি ইত্যাদি খাওয়া ত ছিলই। কিন্তু জমিদারবাবু লক্ষ্য করলেন ভৃত্যটি অনেকক্ষন পর্যন্ত কিছুই খাচ্ছে না। তিনি কৌতূহলী হ'য়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

ভৃত্যটি বললে, আজ্ঞে বয়েস হচ্ছে এইবার তাই একটু ধর্মে-কর্মে মন দোব বলে ঠিক করেছি। এখন থেকে আমি একাদশী করবো।

জমিদার শুনে খুশী হলেন যে তাহলে অন্ততঃ মাসে ভৃত্যটির দু'দিনের খোরাকী বাঁচবে। কিন্তু মুখে সে সব না বলে ভৃত্যের ধর্মানুরাগের প্রশংসা করলেন এবং একাদশী করলে কি পুণ্য হয় সে বিষয়ে সবিস্তারে বললেন।

যতই বেলা বাড়তে লাগল, ততই ভৃত্যটির ক্ষুধা বৃদ্ধি পেতে লাগল। ক্রমে ক্ষুধার যন্ত্রণা তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। সে নিজেকে এই বুঝিয়ে সংযত রাখলে যে আর কিছুক্ষণ বাদেই মনিবের সঙ্গে নানা উপাদেয় খাদ্য গ্রহণ করে তার উপবাস ভঙ্গ হবে।

এদিকে মনিবটি আগে থেকে ভৃত্যের প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত হ'য়ে এক ময়রায় দোকানে গিয়ে গোপনে আহারাদি সেরে এলেন। ভৃত্য দেখে গভীর রাত হতে চলল, অথচ ভোজনের কোনই আয়োজন নেই। শেষে মনিবকে বললে, বাবু রাত হল এখনও তো একাদশীর কোন আয়োজন করা হয়নি, একবার খবর নেব কি? মনিব বললেন, আজ

যে ভীম একাদশী, নির্জলা উপবাস করার নিয়ম। আজকের দিনে খাওয়ার কথা মুখে আনলেও পাপ।

অগত্যা ভৃত্যটি চুপ করে গেল। তবে সিদ্ধান্ত করলে ভবিষ্যতে আর একাদশী করবে না। ভালো মন্দ খাওয়ার চেয়ে তার ভাত মুড়িই ভাল।

কেউ যদি তাকে একাদশী করার সঙ্কল্প ত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করত, সে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলত, কপাল গো কপাল, বাবু যেদিন একাদশী করেন সেই দিনই লুচি, ক্ষীরমোহন, সন্দেশের আয়োজন হয়। আর আমি যেদিন একাদশী করতে চাই, সেদিনই ভীম একাদশী, নিরন্ন উপবাস।

মাকড় মারলে ধোকড় ঃ

এক ধোপা একদিন একটি মাকড়সা মেরে ফেলে। জীবহত্যা করেছে বলে সে ভট্টাচায্যির কাছে হাজির হল তাকে কি করতে হবে সেই সম্পর্কে জানতে। ভট্টাচায্যি তাকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করালে। একদিন ধোপার সামনেই ভট্টাচায্যির ছেলে একটি মাকড়সা মেরে ফেললে। ধোপা ভট্টাচায্যিকে সে কথা জানালে। কিন্তু ভট্টাচায্যি হেসে বললে, মাকড় মারলে ধোকড় পায় অর্থাৎ কাপড় চোপড় লাভ হয়। ছেলের বেলায় ভট্টাচায্যি আর প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিল না।

মৃগনাভি কস্তুরী ঃ

জনৈক ব্যক্তি তার ভৃত্যকে নির্দেশ দিলেন সে যেন মৃগনাভি কিনে আনে। ভৃত্যটি 'মৃগনাভি' কথাটি ভুলে যায়। বেনের দোকানে গিয়ে সে চায় বৃক ভান্নু নন্দিনী। এই থেকেই এটির উৎপত্তি।

মাচা নাই তার বুধবার ঃ

ধানের মরাই বা গোলাকে বলে মাচা। এক ব্যক্তি জনৈক গোপ-গৃহে ঘুঁটে আনতে গিয়েছিল। কিন্তু গোপটি ঘুঁটে দিতে মোটেই ইচ্ছুক

ছিল না। তাই সে না দেবার কারণ স্বরূপ বললে, সেদিন বুধবার ঘুঁটে দেওয়া যাবে না।

এই কথা শুনে ঘুঁটে নিতে আসা লোকটি স্বভাবতঃই ক্ষুব্ধ হয়। সে বলে যায় এক মুঠো চাল পর্যন্ত নেই, তার বুধবার বলার ফল কি? অর্থাৎ 'মাচা নেই তার বুধবার।'

মূলো চোরের ফাঁসী ঃ

এক ব্যক্তি কোন এক চাষার ক্ষেতে মূলো চুরি করেছিল। চাষা তখন ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মেং আলিএট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করে। ম্যাজিষ্ট্রেট চুরি কর্মকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তাই তিনি ঐ মূলা চোরকে ফাঁসির হুকুম দেন। এই ঘটনাটি থেকেই প্রবাদটির উৎপত্তি। কথিত হয় যে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে, বাংলা ১২১২ সালে ফাঁসিটি দেওয়া হয়েছিল।

মাকড় মারলে ধোকড় হয়, চালতা খেলে বাকড় হয় ঃ

এক ব্রাহ্মণ সন্তান একটি অন্ত্যজ জাতির শিশুর সঙ্গে খেলছিল। ক্রীড়াচ্ছলে ব্রাহ্মণ সন্তান একটি পোকা মেরে ফেলে। তখন তার সঙ্গী বালকটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে তার কাজটি মোটেই ভাল হয়নি। জীবহত্যা করায় তার পাপ হবে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ সন্তান বলে ওঠে যে কীট হত্যায় কোন পাপ হয় না, বরং সঙ্গী যে চালতা খাচ্ছে তাতেই পাপ, পেটে বাকড় হবে।

মেঙ ধরে কে ঃ

বেড়ালের ভয়ে ইঁদুরেরা ত অস্থির। কখন কে যে বেড়ালের শিকার হবে তার ঠিক কি? এইরকম অবস্থা দেখে একদিন সব ইঁদুর মিলে

একটি সভা ডাকল তাদের ইতি কর্তব্য স্থির করতে। সভায় সাব্যস্ত হ'ল বেড়াল একা, কিন্তু ইঁদুরেরা সংখ্যায় অনেক। অতএব সব ইঁদুরে মিলে যদি বেড়ালকে চেপে ধরে, তবে সেক্ষেত্রে বেড়ালের আর কোন উপায় থাকবে না। সভায় স্থির হল এক একজন ইঁদুর বেড়ালের এক একটি অঙ্গকে ধরবে। যেমন কেউ ধরবে বেড়ালের কান, কেউ ধরবে বেড়ালের পা, কতকগুলি মিলে বেড়ালের লেজ ধরবে, এমন কি এই ভাবে বেড়ালের মুখটি ধরারও ব্যবস্থা হল। সব শোনার পর একটি প্রবীণ ইঁদুর বললে, 'সবাই তো বেড়ালের দেহের সব অংশ ধরবে, কিন্তু বেড়াল যখন 'মেও' করে ডেকে উঠবে, তখন সেই 'মেও' ধরবে কে ?' অর্থাৎ বেড়ালের ডাকেই ইঁদুরের আত্মাপুরুষ ভয়ে উড়ে যায়। অতএব ইঁদুরদের যে বেড়ালকে ধরার এত সলাপরামর্শ, এক বেড়ালের ডাকেই সে সব কোথায় উড়ে যাবে।

মোটা কাটী চিকন কাটী।
তোর বাপের কি ধার ধারী।

আগেকার দিনে স্ত্রীলোকদের কাটনা কাটা রীতি ছিল। এক ব্যক্তি এক স্ত্রীলোককে সে মোটা সূতা কাটায় পরিহাস করলে, স্ত্রীলোকটি অতিশয় ক্ষুব্ধ হয় এবং প্রবাদটি বলে।

মামার জয় ঃ

এক ছিল শৃগাল। খুবই বুদ্ধিমান সে। সে বাঘ এবং মহিষ দু'জনকেই 'মামা' বলে সম্বোধন করত। এতে দু'জনেই বেশ শ্লাঘা বোধ করত। একদিন মহিষের সঙ্গে বাঘের লড়াই শুরু হল। শৃগাল বেশ নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে উভয়কেই উৎসাহ দিতে লাগল। সে বারংবার বলতে লাগল, 'মামার জয়'।

তার 'মামার জয়' কথাটি শুনে দু'পক্ষই ভাবলে শৃগাল বুঝিবা তাকেই সমর্থন করছে, তারই জয় কামনা করছে। আসলে শৃগাল

জানত লড়াইয়ে দু'জনের মধ্যে একজন জিতবে। যেই জিতুক না কেন, সেই তার মামা। সুতরাং সে তার প্রীতিভাজন হবেই।

মাছি মারা কেরাণী :

এক কেরাণী একদিন একটি খাতার নকল করছিল। যে খাতা থেকে নকল করছিল, সেই খাতার এক জায়গায় একটি মাছি মরে পাতার মধ্যে লেগে ছিল। বেশ বোঝা যায় খাতা লেখার সময় মাছিটি কোনক্রমে তার মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। তারপর খাতা বন্ধ করায় তার মৃত্যু হয়। মাছিটি খাতার ভেতর থেকে আর বেরোবার সুযোগ পায় নি।

কিন্তু কেরাণী বাবুটি ভাবলে তার কাজ নকল করা, অতএব খাতায় যা আছে তার সবই তার নকল করা চাই হুবহু। তাই একটি মাছি ধরে সেটিকে মেরে প্রথম খাতায় যেস্থানে মাছিটি ছিল, সে তার নকল করার খাতারও সেই স্থানেই মাছিটিকে রেখে খাতাটি বন্ধ করে দিল।

যত দোষ নন্দ ঘোষ :

বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অতিশয় দুর্দান্ত প্রকৃতির। তিনি কাউকেই গ্রাহ্য করতেন না এবং অন্যের উপর উৎপীড়ন অত্যাচারে রত থাকতেন। শ্রীকৃষ্ণের উৎপাতে ব্রজবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তাদের মনে এরূপ একটা ধারণা জন্মাল যে নন্দ ঘোষের ছেলে ছাড়া অন্য কারো পক্ষে কোন প্রকার অন্যায় করা সম্ভব নয়। সুতরাং অন্যের দ্বারা অনুষ্ঠিত অন্যায় কার্যের জন্যও শ্রীকৃষ্ণকে দোষী সাব্যস্ত ক'রে নন্দ ঘোষের কাছে অভিযোগ করা হ'ত। এরূপ অভিযোগ প্রায়ই হত। নন্দ ঘোষ যখন জানতে পারলেন যে সব অন্যায় কার্যের জন্যই কৃষ্ণ দোষী নন, তখন তিনি মিথ্যা অভিযোগে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন 'যত দোষ, নন্দ ঘোষ' এইভাবেই প্রবাদটির উৎপত্তি।

যতদূর পা ছড়াও ততদূর ঝাঁতলা :

এক বাগদী তার মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র দেখতে গিয়েছিল। সে ফিরে এলে সকলে তার কাছে পাত্র সম্বন্ধে জানতে চাইলে। বাগদীটি পাত্রের সম্পর্কে অন্য কিছু না বলে শুধু বললে, 'যতদূর পা ছড়াও ততদূর ঝাঁতলা।' 'ঝাঁতলা' এক ধরনের মাদুর। বাগদী নিজে এত দরিদ্র ছিল যে তার বাড়ীতে ঝাঁতলাও ছিল না। ফলে তাকে খালি মেঝেতে শুতে হ'ত। কিন্তু কন্যার জন্য যে পাত্র দেখতে গিয়েছিল, তার বাড়ীতে বিরাট আকারে ঝাঁতলা দেখে সে বড়ই পুলকিত হয়েছিল। তাই সে বললে যে মেয়ে ভাবী শ্বশুর বাড়ীতে খুব সুখেই থাকবে। যতদূর সে বাড়ীতে পা ছড়াও সেই পা ঝাঁতলাতে পড়বে, মাটিতে পড়বে না।

যার ধন তার ধন নয় নেপোয় খায় দই :

এক ছিল ব্রাহ্মণ। বড় কৃপণ। খরচের ভয়ে পেটে খায় না, ভাল পরে না, মাথায় তেল দেয় না। এমন কি অসুখ হলে ওষুধ পর্যন্ত খায় না।

একবার ব্রাহ্মণের খুব অসুখ হয়েছে। এক প্রাচীনা ব্রাহ্মণ পত্নীকে পরামর্শ দিলে ব্রাহ্মণকে মিছরীর সরবৎ খাওয়াতে। ব্রাহ্মণী সেইমত খাওয়াতে গেলে ব্রাহ্মণ তা জানতে পেরে সরবৎ ফেলে দিলে। তার অভিযোগ, খেয়েই সর্বস্বান্ত হতে হবে!

সেদিনটি ছিল শিব চতুর্দশী। আঙ্গিনার যেখানে ব্রাহ্মণ গঙ্গাজলযুক্ত মিছরীর জল ফেলে দিল, সেখানে একটি বেলগাছ ছিল। সেই বেল-গাছের মূলে বাস করতেন মহাদেব। মহাদেব তো ব্রাহ্মণের ওপর খুব খুশী। তিনি আশীর্বাদ করলেন যাতে ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে।

ব্রাহ্মণ করজোড়ে বললে আরোগ্য লাভের জন্য তার কোন ব্যাকুলতা নেই। তার একটিই প্রার্থনা তার অর্থের যেন কোন রকম অপব্যয় না হয়। মহাদেব বললেন, তথাস্তু। তিনি জানিয়ে দিলেন যে ব্রাহ্মণ নিজে তার অর্থ ভোগ করতে পারবে না, রক্ষক মাত্র হয়ে থাকবে।

ব্রাহ্মণের ভয় হল, তবে কি তার অর্থ অন্য লোকে ভোগ করবে?

প্রাণ থাকতে তা সে হতে দেবে না। রোগমুক্ত হবার পর ব্রাহ্মণ একখণ্ড পাথরের ভেতর তার যাবতীয় ধন-রত্ন ঢুকিয়ে ভাল করে তার মুখটি বন্ধ করে গোপনে সাগর জলে ফেলে দিল।

এদিকে বড় নগরের রাজাকে তাঁর চিকিৎসক পরামর্শ দিয়েছেন সমুদ্র বায়ু সেবন করবার। রাজা খবর করলেন সমুদ্র বায়ু সেবনের আগে যদি কারোর কিছু প্রার্থনা থাকে, তবে তাঁর কাছে এসে যেন হাজির হয়। সকলের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি বিদায় নেবেন যাতে নীরোগ হয়ে শীঘ্র রাজ্যে ফিরে আসতে পারেন। রাজার ধোপা রাজার কাছে এসে প্রার্থনা জানাল, 'মহারাজ, আমার জন্য একখানা পাথর আনবেন। আপনার কাপড় কাচতে বড় কষ্ট হয়।'

রাজা সমুদ্রযানে বায়ু সেবনে বের হলেন। অনেকদিন পর সুস্থ দেহে তিনি স্বদেশে ফিরলেন। ফেরবার সময় সমুদ্রযান একজায়গায় নোঙ্গর করেছিলেন। সেখানে সন্ধান মিলল একটি পাথরের। এটি সেই ব্রাহ্মণের ধনপূর্ণ পাথর। ব্রাহ্মণ সমুদ্রের জলে পাথরটি ফেলে দিয়ে সমুদ্র তীরেই বাস করছিল পাথরের পরিণাম কি হয় তা দেখার জন্য।

রাজা পাথরটি নৌকায় নিয়ে নিজের রাজ্যে নিয়ে এলেন এবং ধোপাকে দিলেন। ধোপা এই পাথরে মনের আনন্দে কাপড় কাচতে লাগল। ব্রাহ্মণত সমুদ্র তীর ছেড়ে সন্ন্যাসীর বেশে ধোপা যেখানে কাপড় কাচে, সেখানে নদীর তীরে এসে বসবাস শুরু করলে।

কাপড়ের আঘাতে আঘাতে পাথরের জোড়ের জায়গাটা আলগা হয়ে কিছু টাকা বের হল। ধোপা মহা আহ্লাদে সেগুলি আত্মসাৎ করল। একদিন ধোপার ইচ্ছে হল সন্ন্যাসীকে কিছু অর্থ দান করবে। সন্ন্যাসীবেশী ব্রাহ্মণ ধোপার দেওয়া অর্থ কিন্তু গ্রহণ করল না। ধোপাটির নাম নেপো। তার এতে মনে বড় দুঃখ হল। সে ভাবলে যেভাবেই হোক সাধুর কিছু সেবা করতে হবে। এই ভেবে এক ঘোষকে দিয়ে কিছু দই আনিয়ে তার ভেতরে গোপনে গোটা দশেক মোহর দিয়ে সন্ন্যাসীর কাছে পাঠিয়ে দিল। অবশ্যই ঘোষকে বারণ করে দিলে যেন সে ধোপার কথা সন্ন্যাসীর কাছে কিছু না ভাঙ্গে। ঘোষ তাই করল।

এদিকে কতকগুলি বর্গী কোন স্থান লুঠ করে ফিরছিল। তারা সন্ন্যাসীর কুঁড়েতে অন্য কিছু না পেয়ে দইয়ের হাঁড়ি থেকে বেশ খানিকটা দই খেল, আর কিছু দই সহ হাঁড়ি নেপোর পাথরের পাশে ফেলে নেপোর দু'দশটি কাপড় নিয়ে—তাকে দু'চার ঘা মেরে চলে গেল। নেপো তার প্রাণ রক্ষা পেয়েছে ভেবে আনন্দে অবশিষ্ট দইটুকু খেতে লাগল। সন্ন্যাসী তার কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে নেপোকে বললে—

'এই দিকে যে দই-এর হাঁড়ি নিয়ে এলো কই ?'

নেপো তখন জবাব দিলে, 'যার ধন তার ধন নয় নেপোয় খায় দই !' এই কথা বলে নেপো নাচতে লাগল। সে কিভাবে টাকা পেয়েছিল সব কথা সন্ন্যাসীকে খুলে বলল। সন্ন্যাসী তো সব শুনে মাথায় হাত দিল।

যারে দেয় না মৌলা কি করবে তার আসফদ্দৌলা :

আসফদ্দৌলা ছিলেন অযোধ্যার দানশীল নবাব। দানশীলতার জন্য তিনি ছিলেন সুপরিচিত। একদিন এক ভিক্ষুক লক্ষ্ণৌয়ের পথে এই বলে ফিরছিল যে 'যারে না দেয় মৌলা, তারে দেয় আসফদ্দৌলা। নবাবের কানে কথাটি গেল। তিনি কথাটি পরীক্ষা করে দেখতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। একখানি রুটির মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা ভরে সেটি ভিক্ষুককে দেওয়া হল। দেখা গেল ভিক্ষুকটি পরের দিনও একইভাবে ভিক্ষা করছে। আসলে সে প্রাপ্ত রুটিটি ভারি দেখে ভেবেছিল সেটি কাঁচা আছে। তাই সে রুটিটি অপর এক ভিক্ষুককে বিক্রয় করে দিয়েছিল। নবাব তখন তাকে বুঝিয়ে দিলেন, 'যারে দেয় না মৌলা কি করবে তার আসফদ্দৌলা।'

যারে দিয়ে রামের মা, তারে তুমি চিনলে না :

কোন রমণীর একটি কৃতী পুত্র ছিল। পুত্রটির নাম রাম। রামের যেমন নাম, তেমনিই ঐশ্বর্য। জননী তাই পুত্র গরবে গরবিনী। পুত্রটিও বড়ই মাতৃভক্ত। মায়ের কথাতেই সে সবসময়ে ওঠে বসে। গৃহে জননীই সর্বেসর্বা। বাড়ীর কর্তা জীবিত, কিন্তু গৃহিণী বৃদ্ধ, অক্ষম

স্বামী বেচারীকে গ্রাহ্যই করেন না। তাই বৃদ্ধ স্বামী গৃহিণীকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন:

'যারে দিয়ে রামের মা,
তারে তুমি চিনলে না।'

যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে:

এক ধোপার একটি গাধা ছিল। ধোপা গাধাটিকে বড় খাটাত। অথচ তাকে ভালভাবে খেতে পর্যন্ত দিত না। মধ্যে মধ্যে ধোপা গাধাকে অন্যের শস্যক্ষেত্রে ছেড়ে দিত শস্য ভক্ষণের জন্য। কিন্তু যার ক্ষেত, সে গাধাকে আচ্ছা করে মেরে তাড়িয়ে দিত। ধোপা এই দেখে একটি কৌশলের আশ্রয় নিল, তার কাছে ছিল একটি বাঘের ছাল। সে সেই ছালটি গাধাকে পরিয়ে ক্ষেতে ছেড়ে দিতে লাগল। কৃষক গাধাকে সত্য সত্যই বাঘ মনে করে তাকে আর তাড়াতে সাহস পেত না। বরং নিজেই ভয়ে পালাত। ওদিকে গাধা মনের সুখে ক্ষেতের ফসল ধ্বংস করত। একদিন রাতে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। ক্ষেতে ফসল খেতে খেতে গাধার মনে ফূর্তি এলো। সে প্রাণ খুলে গান জুড়ে দিল। আর যায় কোথায়, কৃষক গাধার স্বরূপ বুঝে ফেললে। বেধড়ক ঠেঙিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিল।

যাঁহা পঞ্চান্ন তাঁহা ছাপ্পান্ন:

এক ব্যক্তি বাল্যকাল থেকেই অসৎ সংসর্গে মিশে নানা কু-কার্যে কাল কাটাত। পরবর্তীকালে ব্যক্তিটি দস্যুদের সর্দার হয়ে উঠল। তার লাঠির আঘাতে অনেককেই ভবলীলা সাঙ্গ করতে হয়েছিল। ক্রমে ঐ দস্যুসর্দার যখন বার্ধক্যে উপনীত হল, তখন মানসিক শক্তি হ্রাস পাওয়ার জন্য এবং পরকালের কথা চিন্তা করে ভীত হয়ে পড়ল। দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করে সে অনুতপ্ত হৃদয়ে দেবারাধনায় ব্রতী হ'ল। দস্যুটির অনুশোচনা এবং প্রার্থনায় তুষ্ট হ'য়ে তার অভীষ্ট দেবতা মানুষের মূর্তি

ধারণ করে তার সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি দস্যুকে একটি কৃষ্ণবর্ণের জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড দিয়ে বললেন, 'বৎস, এই বস্ত্রখণ্ডটি তোমার কাছে রেখে দাও। যেদিন দেখবে এই কালো কাপড় সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেছে, সেইদিন তোমার সমস্ত পাপ ক্ষয় হবে।

দস্যু সেই বস্ত্রখণ্ডটি নিয়ে তীর্থে তীর্থে পর্যটন করে বেড়াতে লাগল। সে কত ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করল, কত সন্ন্যাসীর পায়ের ধূলো মাথায় নিল কিন্তু তবু তার মনোবাসনা পূর্ণ হল না। বস্ত্রখণ্ডটি আর সাদা হল না।

একদিন দস্যুটি একটি বন্যপথ দিয়ে তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে যাচ্ছে এমন সময়ে নিকটবর্তী অরণ্যের অন্তরাল থেকে এক রমণীর বিলাপ তার কানে এল। বিস্মিত হয়ে সে এগিয়ে গিয়ে দেখল এক বিশালাকৃতির দস্যু এক রূপবতী যুবতীর প্রতি অত্যাচার করতে উদ্যত। যুবতীটি করুণকণ্ঠে পাষণ্ডটির করুণা ভিক্ষা করছে, কিন্তু পাষণ্ডটি তাতে কর্ণপাত না করে যুবতীটিকে আকর্ষণে রত।

এই দৃশ্য দেখেই প্রাচীন দস্যুর মনে ভয়ানক ক্রোধ উপস্থিত হ'ল। সে বুঝলে বলবান পাষণ্ডের হাত থেকে অসহায় রমণীকে রক্ষা করতে হ'লে তাকে আঘাত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কোন অনুরোধ উপরোধে কাজ হবে না। প্রাচীন দস্যুটির হাতে ছিল মোটা বাঁশের লাঠি। ডাকাতি ও দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করলেও তার চিরকালের সঙ্গী লাঠিটি সে ত্যাগ করেনি। যৌবনে এই লাঠির আঘাতে সে পঞ্চান্ন জন মানুষের জীবন নিয়েছিল। একটু ইতস্ততঃ করে প্রাচীন দস্যুটি যুবতীর প্রতি অত্যাচারে উদ্যত বলবান ব্যক্তিটির পেছনে এসে দাঁড়াল। তারপর 'যাঁহা পঞ্চান্ন তাঁহা ছাপান্ন' বলে তার মাথার ওপর সজোরে লাঠিটির আঘাত হানল। অত্যাচারী ব্যক্তি সাথে সাথে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল। অসহায় যুবতীটি উদ্ধার লাভ করল।

হঠাৎ প্রাচীন দস্যুসর্দারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল তার সঙ্গের কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রখণ্ডটির প্রতি। দেখলে সেটি পুরোপুরি সাদা হয়ে গেছে। যুবতীটিকে রক্ষা করায় তার জীবনের সকল পাপ নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল।

যে দামে কেনা, সেই দামে বিক্রী :

একজন একটি ঘোড়া বেচতে এসেছে। ঘোড়াটি খুবই ভাল, কিন্তু চোরাই মাল। অনেকেই ঘোড়াটি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করল। ঘোড়াটির বর্তমান অধিকারী সুযোগ বুঝে বেশ চড়া দাম হেঁকে বসল। দাম শুনে ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেক ক্রেতাই পিছিয়ে গেল। কিন্তু একজন ক্রেতা এর পরও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করল। সে চড়া দামেই ঘোড়াটি কিনতে রাজি। লোকটি জানতে চাইলে, ঘোড়াটির চালচলনে কোন ত্রুটি আছে কি না। ঘোড়ার বর্তমান মালিক জোরের সঙ্গে বললে, 'বেশ তো পরীক্ষা করেই দেখে নাও না।'

ক্রেতাটি তখন ঘোড়াটিতে চেপে একটু এদিক ওদিক করে শেষে পুরোদমে ঘোড়াটি চালিয়ে দিল। নিমেষের মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর ফিরল না। অনেকেই বেশি দাম চাওয়ায় বিক্রেতার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল। একজন পরিহাস করে বললে, 'কি হে, কত লাভ করলে?' বিক্রেতা গম্ভীর ভাবে জবাব দিলে, 'লাভ আর হল কই, 'যে দামে কেনা সেই দামে বিক্রী।'

যুগীর গীতে ভণিতা নাই :

গীত শুরু হবার আগে গায়ক বাদ্যযন্ত্রাদির সঙ্গে তার কণ্ঠ মিলিয়ে নিয়ে প্রথমে রাগরাগিনীযুক্ত তানমানাদি প্রকাশ ক'রে তবেই আসল গান শুরু করে। সঙ্গীত শুরু করার আগে যে ভূমিকা তাকে বলে আলাপ। যুগী অর্থাৎ জোলারা কিন্তু সভায় উপস্থিত হয়ে রাগরাগিনীর আলাপ না করেই সরাসরি গান শুরু করে দেয়। সেই জন্যই এই প্রবাদটির উৎপত্তি।

রাম খোদা :

একবার এক অত্যুৎসাহী হিন্দু এবং এক গোঁড়া মুসলমানের বিবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদের বিষয়টি চিরপুরাতন—কার দেবতা সত্য এবং অধিকতর শক্তিশালী।

হিন্দুটি বললে, আমাদের হিন্দুর দেবতাই সত্য। তাঁর নাম নিলে সব বিপদ কেটে যায়। হিন্দুর দশ অবতার পর ব্রহ্মেরই অংশ, ম্লেচ্ছের আবার দেবতা।

এদিকে মুসলমানটিও ছাড়বার পাত্র নয়। সে হিন্দুর কথায় ক্ষুব্ধ হল। বললে, সকল দেবতাই এক, রাম রহিমে কোন ভেদ নেই।

হিন্দু তখন বললে, বেশ এসো বাজি ধরা যাক, দেখ কার দেবতা সত্য।

মুসলমানটিও পিছু হটার পাত্র নয়। সে দস্তুরমত প্রত্যহ নামাজ পড়ে, তার ওপর হজও করা হয়ে গেছে। অতএব সে তার দেবতা যে সত্য তা প্রমাণে উদগ্রীব হয়ে উঠল। সে প্রস্তাব দিল, এসো, আমরা দু'জনে এই আমগাছটাতে উঠি। তারপর নিজের নিজের দেবতার নাম নিয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়ি। যার দেবতা সত্য, লাফিয়ে পড়লেও তার কিছুই হবে না।

হিন্দুটি ঠিক এমনতর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু এখন আর অসম্মত হবার উপায় নেই। অগত্যা তাকেও রাজি হতে হ'ল। জেদ বলে কথা, তা তো আর সহজে ছাড়া যায় না।

হিন্দুটি মুসলমানটিকে বললে আগে লাফাতে। সেইমত মুসলমানটিই প্রথম আমগাছ থেকে মাটিতে লাফ দিলে। লাফ দেবার সময় সে 'খোদা'কে স্মরণ করেছিল। দেখা গেল মুসলমানটি মাটিতে পড়ার পরও তার কিছুই হয়নি। এইবার হিন্দুটির পালা।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে আমগাছে উঠল এবং 'রাম' নাম স্মরণ করে গাছ থেকে লাফ দিলে। লাফ দিয়েই তার মনে হল যদি মুসলমানের খোদাই সত্য হয়। তাই সে নিজের হাত পা বাঁচাবার তাগিদে মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'খোদা' বলে চীৎকার করে উঠল।

রাম বলা ধুতি তোলা, দু'দিক কি সাজে ?

দু'জন লোক নদী পার হচ্ছিল। এদের মধ্যে একজন ছিল খুব ভক্ত প্রকৃতির এবং দেবতায় বিশ্বাসী। অপরজন ছিল সংশয়ী। প্রথমজন

ভাবলে রামনামের এমনই মহিমা যে তার জোরে পাথরও জলে ভাসে। মানুষ এই নামের জোরে ভবসাগর অবলীলাক্রমে পার হয়, সে তুলনায় সামান্য নদী তো কোন ছার। অতএব সে নিশ্চিতে রাম নামের ওপর নির্ভর করে নদীটি পার হয়ে গেল।

দ্বিতীয়জন নদী পার হবার সময় মুখে রাম নাম বললেও পাছে নদীর জলে কাপড় ভিজে যায়, তাই যতদূর সম্ভব জল থেকে তার কাপড় উঁচুতে তুলে ধরলে। নদী পার হবার পর দেখা গেল দ্বিতীয়জনের কাপড় জলে বেশ ভিজে গেছে। তখন প্রথমজন তাকে এই কথাটি বলেছিল।

রেতের ঠাকুর কেদার রায়, রেতে আসে রেতে যায় ঃ

মাতৃভক্ত সন্তানের কাহিনী অবলম্বনে প্রবাদটি সৃষ্টি। মাতৃভক্ত সন্তানটি হলেন কেদার রায়। এর বসতি ছিল সিউড়ি মহাম্মদাবাদের নিকটবর্তী 'আঙ্গারগড়' নামক গ্রামে। ইনি চাকুরীজীবী ছিলেন, চাকুরী করতেন মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে। কেদার রায়ের জননী যাতে সহজে গঙ্গাস্নান করতে পারেন, সেইজন্য ইনি নিজের বাসগ্রাম অর্থাৎ 'আঙ্গারগড়' থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত একটি পথ প্রস্তুত করান। দিনের বেলায় নবাব দরবারে কার্যে ব্যস্ত থাকায় ইনি রাত্রিবেলায় মুর্শিদাবাদ থেকে ঘোড়ায় চড়ে স্বগ্রামে উপস্থিত হতেন, নির্মীয়মান রাস্তার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতেন এবং মজুরদের পারিশ্রমিক দিয়ে পরদিন সকালেই আবার মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে যাত্রা করতেন। এই কারণে জনগণ তাঁকে রেতের ঠাকুর বলে অভিহিত করতেন।

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন ঃ

বৈষ্ণবচরণ শেঠ ছিলেন প্রাচীন কলকাতার একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। এর বাসস্থান ছিল বড়বাজারে। এঁর সময়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন ধনী এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যবসায়ী হিসাবে বৈষ্ণবচরণের সুনাম ছিল। বৈষ্ণবচরণের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত

আছে। তেলিঙ্গানার রাজকুমার রামরাজা কলকাতা থেকে তাঁর দেবারাধনার জন্য গঙ্গাজল নিয়ে যেতেন। কিন্তু কলকাতা থেকে সংগৃহীত গঙ্গাজলে বৈষ্ণবচরণের মোহর অঙ্কিত না থাকলে রাজকুমার তা ব্যবহার করতেন না।

একদা বৈষ্ণবচরণ তাঁর এক অংশীদার গৌরী সেনের নামে প্রচুর রাঙতা কিনেছিলেন। পরে দেখা গেল সেই রাঙতার অধিকাংশ রৌপ্য মিশ্রিত। বৈষ্ণবচরণ এই রাঙতার ব্যবসায়ে যা লাভ হল, তার কপর্দকও গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন, গৌরী সেনের নামে কেনা জিনিসের লভ্যাংশ অবশ্যই গৌরী সেনের প্রাপ্য। গৌরী সেন নিজে অনেক করে বলা সত্ত্বেও বৈষ্ণবচরণ রাঙতা বিক্রয়ের লভ্যাংশ গ্রহণ করলেন না। ফলে সামান্য ব্যবসায়ী গৌরী সেন প্রভূত বিত্তের মালিক হয়ে পড়লেন। বিপুল সম্পদের মালিক হ'য়ে গৌরী সেন কারবারে উত্তরোত্তর উন্নতি করতে লাগলেন।

গৌরী সেন তাঁর অর্থের সদ্ব্যবহার করতেন। তাঁর ঝোঁক ছিল যদি কেউ দেনার দায়ে জেলে যেত, তিনি অর্থের সাহায্যে তাকে উদ্ধার করতেন। অথবা কোন দরিদ্র ব্যক্তি অন্যায়ভাবে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হলে তিনি তাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন।

এইভাবে নানা উপায়ে গৌরী সেন অর্থ বিতরণ করায় লোক অনেক সময়ে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই কোন একটা কাজ করে বলত এই আশায় যে টাকা লাগলে তা গৌরী সেনের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে।

লজ্জা বন্ধন ন্যায়ের কথা ঃ

এক ব্যক্তি অতিশয় ক্ষুধার্ত হয়ে উঁচু এক স্তম্ভের ওপরে তার শরীরের সমস্ত ভারটি রেখে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি কিছু খই এনে ঐ ক্ষুধার্ত্তকে বললে, 'ওরে তুই আঁজলা পাত তোরে আমি কিছু খই দেই।' এই কথায় ক্ষুধার্তটি ব্যগ্রভাবে থামটির দু'পাশে দু'হাত রেখে অঞ্জলি পাতলে। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তার ঐ অঞ্জলিতে খই ঢেলে দিল। কিন্তু ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটি না পারে খেতে, না পারে অন্যকে দিতে।

এদিকে বাতাসে খইগুলি উড়ে যেতে লাগল। তবু ক্ষুধার্তটি শেষ পর্যন্ত সে খই খেতে পারবে এই ভরসায় বন্ধন মুক্ত হতে পারল না, সে খইয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রইল।

লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায় :

এক ব্যক্তি সামান্য কিছু মূলধন সংগ্রহ করে ব্যবসা আরম্ভ করলে গুড়ের। প্রথমে সে তার সীমিত মূলধনে মাত্র এক কলসী গুড় কিনেছিল। গুড় বিক্রয় করে তার মূলধন উঠে যাবার পর দেখা গেল তখনও কলসীতে কিছুটা গুড় অবশিষ্ট আছে। ব্যক্তিটি বুঝলে অবশিষ্ট গুড়টুকুই তার লাভ। ঐ গুড়টুকু বেচে সে যে পয়সা পাবে, তাই হবে তার লাভ। কিন্তু পরদিন দেখে কলসীর গুড় ফাঁকা, সমস্ত গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে ফেলেছে। বেচারীর আর লাভের পয়সা হাতে পাওয়া হল না।

লাথি মেরে বিষ্ণবে নম :

একটি স্থানে অন্যান্য অনেকগুলি লোকের সঙ্গে দু'জন ব্রাহ্মণ বসেছিল। প্রথম ব্রাহ্মণের পা একসময়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের গায়ে লাগায় প্রথম জন দ্বিতীয় জনকে বিষ্ণবে নমঃ বলল। কিছুক্ষণ পরে আবার প্রথম জনের পা দ্বিতীয় জনের গায়ে লাগল। এবারও প্রথম ব্রাহ্মণ বিষ্ণবে নমঃ বলে উঠল। তৃতীয় বার ঐ একইরূপ পা লাগা এবং বিষ্ণবে নমঃ বলার পর দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ সজোরে প্রথম জনকে পদাঘাত করে বিষ্ণবে নমঃ বলে। প্রথম জনের পা আর লাগে নি।

লেবু টেবু সব আছে :

এক পথিক একদিন এক গৃহস্থের বাড়ীতে এসে হাজির। গৃহস্থকে সে বললে তার কাছে লেবু টেবু সব আছে, শুধু তার প্রয়োজন একটু থাকার জায়গার। গৃহস্থ ভাবলে এমন লোককে একটু থাকার জায়গা

দেওয়া যেতে পারে। কেন না তার আতিথ্যের জন্য তাকে কিছুই করতে হবেনা, কোন খরচের ব্যাপার নেই। অতএব গৃহস্থের গৃহে পথিক থাকার সুযোগ পেল।

থাকার জায়গা পেয়ে পথিক এবারে গৃহস্থকে বললে, 'কিছু চাল ডাল পাওয়া যাবে কি ?'

বেচারী গৃহস্থ আর কি করে, চাল ডালের ব্যবস্থাও করে দিতে হল। তখন পথিকটি বললে, 'একটা উনান আর রান্না করার কিছু জিনিসপত্র হলেই আমার হয়ে যাবে।'

অগত্যা রান্নার সব যোগাড়ও করে দিতে হল গৃহস্থকে। কিন্তু সেইসঙ্গে ক্ষুব্ধ গৃহস্বামী তার মনের ক্ষোভকে আর চেপে রাখতে পারলে না। বললে, 'আচ্ছা লোক তুমি ত হে ?' তুমি না বলেছিলে, 'লেবু টেবু সব আছে।' কিন্তু এখন দেখছি কিছুই নেই। পথিক মৃদু প্রতিবাদ করে বললে, 'মিথ্যা ত বলিনি, সত্যিই আমার কাছে লেবু টেবু সব আছে,' এই বলে সে তার ট্যাঁক থেকে একটা লেবু বের করে দেখালে। বেচারী গৃহস্থ তখন নিরুত্তর।

লেখা জোখায় ভুল নেই, ছেলে কেন ভাসে ?

এক মুহুরী ছিল বড় হিসেবী। সে একদিন তার স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে এক স্থানে যাচ্ছিল। যাবার পথে পড়েছিল এক নদী। নদী তীরে উপস্থিত হয়ে মুহুরী নদীর জলের গভীরতা কতখানি তা হিসেব করতে বসল। দেখলে যা গভীরতা আছে, তা অনায়াসেই নিজেরাই পার হতে পারা যাবে। অতএব অহেতুক নৌকার খরচ করে লাভ কি ? মুহুরী তার সন্তানদের নদী পার হবার জন্যে বললে। আসলে কিন্তু নদীর জল ছিল বেশ গভীর, মুহুরী তার হিসাব ঠিক পায়নি। অতএব শিশু সন্তানেরা নদার কিছুদূর গিয়েই গভীর জলে ভেসে চলল। মুহুরীর স্ত্রী তা দেখে চীৎকার করে উঠল। মুহুরী ভাসমান সন্তানদের উদ্ধারের জন্য না এগিয়ে এসে হিসেব নিয়ে বসল, নিশ্চয়ই কোথাও

ভুল হয়েছে, নইলে সন্তানেরা জলে ভেসে যাবে কেন ? যাই হোক এক জেলে ভাসমান সন্তানদের উদ্ধার করে দেয় শেষ পর্যন্ত।

লেখাপড়া যেমন তেমন,
কপাল মাত্র গোড়া
চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়ায়
রামা চড়ে ঘোড়া।

দুইভাই ছিল—একজনের নাম চণ্ডীচরণ, অন্যজনের নাম রামচরণ। দুইভাই ছিল প্রকৃতিতে পরস্পর পরস্পরের বিপরীত। চণ্ডীচরণ ছিল অত্যন্ত মনোযোগী ছাত্র, লেখাপড়ায় সে ছিল খুব ভাল। কিন্তু রামচরণ ছিল অত্যন্ত অমনোযোগী। তার লেখাপড়া একেবারেই ভাল লাগত না। শুধু তাই নয়, তার যতসব বদ সঙ্গী ছিল। অল্প বয়স থেকেই সে নানা বদভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। চণ্ডীচরণ সকলের কাছেই উপযুক্ত স্বীকৃতি পেত, কিন্তু রামচরণ পেত অবজ্ঞা এবং ঘৃণা।

একসময় রামচরণ এক নীচ বংশীয়া কন্যার প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। বংশে নীচ হলে কি হবে, কন্যার পৈতৃক অবস্থা ছিল খুব ভাল। রামচরণের সঙ্গে ঐ কন্যার বিবাহের দৌলতে সে ঘরজামাই হল এবং প্রভূত বিত্তের অধিকারী হ'ল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে কন্যাটি ছিল তার পিতামাতার একমাত্র সন্তান।

একদিন রামচরণ ঘোড়ায় চড়ে যাবার সময় দেখলে তার ভাই চণ্ডী অত্যন্ত মলিন পোশাকে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তখন তাকে উদ্দেশ করে রামচরণ ছড়াটি বলে।

লোহা জানে কামার জানে ঃ

এক ব্যক্তি কোন দ্রব্য গড়াবার উদ্দেশ্যে এক কামারের কাছে কিছু লোহা দেয়। কামার বলে যে ঐ লোহাতে বাঞ্ছিত দ্রব্যটির গড়ন ভাল হবে না। আসলে কামার কিছু অধিক লোহা চেয়েছিল। তখন দ্রব্য নির্মাণ করাবার জন্য উপস্থিত ব্যক্তিটি প্রবাদটি বলে।

লোহার কার্ত্তিক ঃ

নদীয়া জেলার কোনো এক পল্লীগ্রামে 'কার্ত্তিক দুলে' নামে একজন ভয়ঙ্কর দস্যু ছিল। কোন সময়ে দস্যুতার অপরাধে সে ধরা পড়ে এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সেকালে যে গ্রামে যে অপরাধীর বাস, সেই গ্রামে বা কাছাকাছি স্থানে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে ফাঁসী দেওয়ার রীতি ছিল। উদ্দেশ্য দণ্ডিত ব্যক্তির গ্রামবাসীদের সাবধান করা। কার্ত্তিকের ফাঁসী হওয়ার পর তার মা 'আমার লোহার কার্ত্তিক কোথা গেল' বলে কেঁদে ছিল। সেই অবধি কথাটি প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

শিয়ালের যুক্তি ঃ

একটি শিয়াল ছিল। সে রাতের বেলায় পেট ভরে খেয়ে তার গর্তে ফিরত। স্বভাবতঃই উদরটি স্ফীত হওয়ায় তার গর্তে প্রবেশ করতে অতিশয় ক্লেশ হ'ত। তখন সে মনে মনে সিদ্ধান্ত করত, পরদিন তার প্রথম কাজ হবে গর্তটির মুখটিকে প্রসারিত করা। কিন্তু পরদিন যখন সে গর্ত থেকে বের হত তখন তার উদর আগের দিনের মত আর স্ফীত থাকত না, ফলে সহজেই বের হ'তে পারত। ফলে গর্ত বৃদ্ধি করার আর কোনও প্রয়োজন বোধ করত না।

শ্রাদ্ধ গড়ায় ঃ

এক ব্যক্তির পিতা মারা গেলে সে পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন করে। একজন পুরোহিতের ওপর ভার পড়ল পৌরোহিত্য করার। শ্রাদ্ধের দিন পুরোহিত তার যজমানকে বললে, সে যা বলবে যজমান যেন সে কথাই বলে। এই বলে পুরোহিত শুরু করলে, 'অমুক মাসী, অমুক পক্ষ, অমুক তিথৌ ইত্যাদি। যজমান হুবহু একই কথা বলে গেল অমুক মাসী, অমুক পক্ষে···। পুরোহিত তখন বললে, ওরে মূর্খ আমি যা বলতে বলি তাই বল। যজমানও বললে, 'ওরে মূর্খ আমি যা বলতে বলি তাই বল।' শেষে দু'জনে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড বিতণ্ডা,

বিতণ্ডা থেকে হাতাহাতি। যজমান পুরোহিত দু'জনেই শ্রাদ্ধ আসর ছেড়ে তখন উঠানে ঝটাপটি করে গড়াচ্ছে। এক বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক শ্রাদ্ধ দেখতে আসরে হাজির ছিল। সে বেগতিক দেখে পালাতে লাগল। এক প্রতিবেশী স্ত্রীলোকটিকে শ্রাদ্ধ কেমন হচ্ছে জানতে চাইলে সে বললে, 'শ্রাদ্ধ গড়াচ্ছে।'

সঙ্গ দোষে শত গুণ নাশে :

প্রাচীনকালে কোন স্থানে কতকগুলি দস্যুর দৌরাত্ম্যে লোকে অস্থির হ'য়ে রাজার শরণাপন্ন হ'ল। রাজাও দস্যুদের খোঁজে লোক নিযুক্ত করলেন। রাজপুরুষেরা দস্যুদের সন্ধান পেলে তারা নিরুপায় হয়ে গায়ে কাদা মেখে, নিকটস্থ বনে ধ্যানমগ্ন 'মাণ্ডব্য' নামে ঋষির চারপাশে চোখ বুজে বসে রইল। রাজপুরুষেরা দস্যুদের সন্দেহ ক'রে তাদের পরিচয় জানতে চাইল। দস্যুরা বললে তারা সব ঋষির শিষ্য।

রাজপুরুষেরা তখন ঋষি সহ দস্যুদের রাজার কাছে হাজির করল। রাজা সকলকে শূলে চড়াবার আদেশ দিলেন। দস্যুরা সকলে মারা গেলেও ঋষি বেঁচে রইলেন। তবে খুব কষ্ট পেলেন। তিনি রাজ পুরুষদের কাছে জানতে চাইলেন তাঁকে শাস্তিদানের কারণ কি? রাজপুরুষেরা বললে দস্যুরা তাঁকে তাদের গুরুদেব বলে বলে গেছে। তাতেই রাজা তাঁকেও দণ্ড দিয়েছেন। যাই হোক ঋষি নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়ে মুক্তি পেলেন। দস্যুদের সঙ্গ দোষে অকারণে তাঁকেও যথেষ্ট কষ্ট পেতে হয়েছিল।

সাজতে গুজতে ফিঙে রাজা :

একবার দেবতা বললেন যে, পরদিন সকালে সর্বপ্রথমে যে তাঁর কাছে এসে হাজির হবে, তাকেই তিনি রাজা করে দেবেন। ব্যাস্, পাখীদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল তীব্র প্রতিযোগিতা। টিয়া, শালিখ, বুলবুলি, সব পাখীই সাধ্যমত সাজগোজে লেগে গেল। রাত থাকতেই

চলতে লাগল তোড়জোড়। পরদিন ভোর হওয়া মাত্র দেবতা সমীপে উপস্থিত হতে হবে ত।

ফিঙে করল কি পরদিন ভোর হওয়া মাত্র নিজের দেহ কালিতে ডুবিয়ে নিয়ে বিনা সাজ সজ্জাতেই দেবতার কাছে হাজির হয়ে গেল। দেবতাও তাঁর কথামত ফিঙেকেই রাজা বলে ঘোষণা করলেন। বেচারী অন্যান্য পাখীদের সাজসজ্জাই সার হল।

সাইত কইরতেই প্যাঁচা রাজার জন্ম ঃ

ছনিয়ার সব পাখী বিধাতা পুরুষের কাছে দরবার করলে তাদের জন্যে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর রাজা সৃষ্টি করেন। প্রতিটি পাখীরই কিছু না কিছু খুঁত রয়েছে, তাই তাদের মধ্য থেকে কাউকে রাজা করা চলে না। বিধাতা পুরুষও পাখীদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তিনি পরিকল্পনা করলেন ময়ূর সৃষ্টির। ময়ূরের সব অঙ্গসজ্জা সম্পন্ন হয়েছে, শুধু বাকি আছে পাছটি। এই সময় একটু লাল রঙের ঘাটতি দেখা দেয়। বুলবুলিকে পাঠানো হ'ল লালরঙ আনতে। বুলবুলি লালরং আনতে গিয়ে শিয়াফুলের মোহে আটকা পড়ে। এদিকে রাজ্যাভিষেকের শুভলগ্ন পার হয়ে যায়। পাখীদের মধ্যে দেখা দেয় বিরাট চাঞ্চল্য। বিধাতা পুরুষও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই সুযোগে কোথায় ছিল প্যাঁচা, সে লগ্নমূহূর্তে সিংহাসনে এসে বসে পড়ে। পরিণামে বেচারী ময়ূরের আর রাজা হওয়া হল না। প্যাঁচা হয়ে গেল পাখীদের রাজা।

সেই মামা, সেই মামী, সেই পুকুর পারে ঘর,
এখন কেন গো, মামী, তোমার ছুধে পড়ে সর ॥

এক ভাগনে তার মামার বাড়ীতে থাকত। মামা ভাগনেকে ভালবাসলেও তার মামী তাকে মোটেই ভালবাসত না। কাজেই ভাগ্নেকে জল মেশানো ছুধ খেতে হ'ত। তাছাড়াও মামী অন্য নানাভাবে ভাগ্নেকে পীড়ন করত। ভাগ্নে কিন্তু কিছু বলত না। নীরবে সব

সহ্য করত। অত্যাচারের মাত্রা একসময় এমন বৃদ্ধি পেল যে ভাগ্নে মামার বাড়ী ছেড়ে বনে পালাল। এদিকে রাজহস্তী ভাগ্নের কপালে রাজটীকা দেখতে পেয়ে বন থেকে তাকে তুলে নিয়ে এসে শূন্য সিংহাসনে বসিয়ে দিল। সে রাজা হয়ে গেল। রাজা হবার পর ভাগ্নেটি একটি দীঘি করার আদেশ দিলে। দীঘি খোঁড়ার জন্যে বহু শ্রমিক এলো। এদের মধ্যে ভাগ্নে তার মামাকেও দেখতে পেলে। সে তাড়াতাড়ি করে মামাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলো। পাল্কী পাঠিয়ে মামীকেও প্রাসাদে নিয়ে এলো। এরপর মামা ভাগ্নে একসঙ্গে খেতে বসলে। খেতে খেতে ভাগ্নে তার মামীকে লক্ষ্য করে বললে ঃ

সেই মামা, সেই মামী, সেই পুকুর পারে ঘর,
এখন কেন গো, মামী, তোমার দুধে পড়ে সর ॥

মামা কথাটির অর্থ বুঝতে না পেরে ভাগ্নেকে ব্যাপার কি জানতে চাইলে। তখন ভাগ্নে সব খুলে বলল। ক্ষুব্ধ মামা তো মামীকে তাড়িয়ে দিতে উদ্যত হল। কিন্তু ভাগ্নের অনুরোধে মামী সে যাত্রায় রেহাই পেল।

সেই মামা, সেই মামী, পুকুর পারে ঘর,
ভাগ্নেকে দুধ দিতে হাতে রাখছ সর ?

এক দরিদ্র গৃহস্থ তার একটি পুত্র সন্তান এবং বিধবা স্ত্রী রেখে মারা গেল। বিধবাটি তার পুত্রকে নিয়ে মহা বিপদে পড়ল। কি করে, অন্য কোন উপায় না দেখে সে তার পুত্র সহ ভায়েদের সংসারে গিয়ে আশ্রয় নিল। বিধবার ভায়েরা খুশী মনে বিধবা বোন এবং ভাগ্নেকে গ্রহণ করল। কিন্তু মামীরা ননদ কিংবা ভাগ্নেকে মোটেই সুনজরে দেখত না। যাই হোক মামাদের সংসারে ভাগ্নের কাজ বলতে ছিল কোনদিন রাখাল কামাই করলে গরু চরান। আর প্রতিদিন দুপুর-বেলায় মামাদের জন্য ক্ষেতে খাবার নিয়ে যেত সে। মামীরা ননদ এবং ভাগ্নেকে অ-খাদ্য কু-খাদ্য খেতে দিত। তার যৎসামান্য খেয়ে বাকি মা ও

ছেলে না খেয়ে ফেলে দিত। তাছাড়া বাক্যের জ্বালা তো ছিলই। কিন্তু বিধবা এবং তার ছেলে মুখ বুজে সব সহ্য করত। কোন কিছুই বলত না।

কয়েক বছর এইভাবে কেটে গেছে। একদিন ভাগ্নে মামাদের জন্য ভাত তরকারী নিয়ে ক্ষেতের দিকে রওনা হলে একটি ঝোপের কাছে এলে শুনতে পেলে কে যেন খাবার দাবার সব তার জন্যে রেখে যেতে বলছে।

ভাগ্নে বললে, তা কি করে সম্ভব। তার মামারা ক্ষুধার্ত্ত। তাদের খাবার অন্য কাউকে দেওয়া সম্ভব নয়। উত্তরে ছেলেটি শুনলে যে তার মামারা তো বাড়ী গিয়ে খেতে পাবে। আরও শুনলে ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করলে তার কল্যাণ হবে।

ভাগ্নে নিজে ক্ষুধার যন্ত্রণা বোঝে। সে নিজেও এ যন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্তু তাই বলে মামাদের খাবার থেকে সে কোনদিনও চুরি করে খায়নি। কিন্তু অন্যের ক্ষুধার কথায় সে কিঞ্চিৎ বিচলিত হ'ল। ঠিক করলে মামাদের খাবার ক্ষুধার্ত্তটিকেই দিয়ে দেবে। কিন্তু ক্ষুধার্ত্তের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেও তাকে সে চোখে দেখেনি। তাই ভাগ্নে জানতে চাইলে, খাবার রাখবে কোথায় ?

উত্তর হ'ল বিন্না ছোবের কাছে।

ছেলেটি সব খাবার দাবার বিন্না ছোবের কাছে রেখে ফিরে গেল। সেদিন মামাদের আর ক্ষেতে খাওয়া হল না। শুধু সেদিনই নয়, এই একই ঘটনা ঘটল পর পর কয়েকদিন। খাবার না পেয়ে মামারা ত রাগে অস্থির। শেষে তারা ভাগ্নেকে খুব করে মেরে তাকে এবং তার মাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল।

বিধবা আর তার ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। কিছু পথ গিয়ে তারা সেই বিন্না ছোবের কাছে এসে একটা বড় গোছের গাছতলায় বসলে। দু'জনেই ভবিষ্যতের কথা ভেবে ব্যাকুল। হঠাৎ ঝোপের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, তাদের দুর্গতির কারণ সেই। তবে কণ্ঠস্বরটি সান্ত্বনা দিল যে তাদের দুর্গতির শীঘ্রই অবসান হবে। কণ্ঠস্বর পরামর্শ দিল, তারা যেন ঐ জায়গাতেই সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকে এবং

সন্ধ্যার অবসানে বিন্না ছোবটির নিকটস্থ মাটি খুঁড়ে মোহর ভর্তি সাতটি ঘটি সংগ্রহ করে। তারপর ঐ রাত্রেই তারা যেন তাদের নিজেদের বাড়ীতে চলে যায়। সেখানেই যেন তারা বাস করতে থাকে। সত্য সত্যই সন্ধ্যার পর নির্দিষ্ট স্থানটি খুঁড়ে মা ও পুত্র মোহরপূর্ণ সাতটি ঘটি পেলে। তারা নির্দেশ মত নিজেদের গৃহে সেই রাত্রেই ফিরে গেল।

প্রাপ্ত মোহরের বলে বিধবার পুত্র জমিদার বনে গেল। নির্মিত হল সুরম্য প্রাসাদ। নিযুক্ত হল অসংখ্য দাস দাসী। সমাজে তার এখন যথেষ্ট প্রতিপত্তি। হঠাৎ তার ইচ্ছা হল প্রাসাদের সামনে একটি পুষ্করিণী খনন করার। ঘোষণা করা হল পুষ্করিণীর খনন কার্যে নিযুক্ত প্রতিটি শ্রমিক প্রতি সাজি মাটির মজুরি বাবদ সাজি পূর্ণ কড়ি পাবে।

এদিকে নতুন জমিদারের মামাদের অবস্থা খুবই কাহিল। তাই মাটি কেটে কড়ি পাবার আশায় তারা সকলে নতুন জমিদারের সরকারের কাছে হাজির হল। জমিদারের নির্দেশমত সরকার মামাদের মনিবের কাছে উপস্থিত করালে। ভাগ্নে ত তার মামাদের দেখেই চিনতে পারলে। কিন্তু মামারা চিমতে পারলে না। জমিদার হুকুম দিলে, এদের মাটি কাটতে হবে না। তার বদলে প্রত্যেকের জন্য নতুন কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিলে, আদেশ করলে স্নানের ব্যবস্থা করে দিতে। স্নানের পর নতুন কাপড় পরে মামারা উপস্থিত হ'লে তাদের সঙ্গে নিয়ে ভাগ্নে আহারে বসল। খেতে বসে ভাগ্নে মামাদের কাছে নিজের পরিচয় দিল। তার মা ও এসে ভায়েদের সামনে দাঁড়ালে। মামারা ত লজ্জায় অস্থির। ভাগ্নে সেইদিনই মামীদের বাড়ীতে আনালে। এখন মামীরা একেবারে অন্য মানুষ। ভাগ্নের আদর যত্নের আর সীমা নেই।

একদিন ভাগ্নে মামাদের সঙ্গে খেতে বসেছে। পরিবেশন করছে মামীরা। ভাল ভাল জিনিস সব ভাগ্নের পাতেই মামীরা দিতে থাকল। এমন কি সম্পূর্ণ দুধের সর তা ও তার পাতেই দিল তারা। তখন ভাগ্নে আর থাকতে পারল না। বললে ঃ

সেই মামা সেই মামী, পুকুর পারে ঘর,
ভাগ্নেকে দুধ দিতে হাতে রাখছ সর ?'

মামারা কথাটির অর্থ জানতে চাইলে। তখন ভাগ্নে মামাদের পূর্ব আচরণের কথা সব বললে। লজ্জায় মামা এবং মামীদের মাথা হেঁট হয়ে গেল।

যথাসময়ে ভাগ্নের বিবাহ হল। ক্ষেত্র ঠাকুরের করুণায় পরম সুখে বৃদ্ধা জননী এবং তার পুত্র ও পুত্রবধূর দিন কাটতে লাগল।

সেদিন আর নাই বাম্‌নি
আগে ভাত পরে আমানি।

কোন এক ব্রাহ্মণের এক রাখাল ছিল। রাখালটি ছিল বোকা। রাখালটিকে ক্রমে শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হতে দেখে তার অন্য রাখাল বন্ধুরা তার রোগা হবার কারণ জিজ্ঞাসা করল। জানতে চাইল, 'তোর মনিব কি তোকে খেতে দেয় না? তুই কি খাস বলত?'

রাখাল বললে, 'খুব খাই, বাড়ীর গিন্নী আমায় খুব ভালবাসেন। আমি যেই গরু চরিয়ে বাড়ি ফিরি, অমনি গিন্নী খুব বড় এক বাটি ফেন আমানি এনে দেয়, আমি একপেট খাই। তারপর ভাত খেতে দেয়, তাও খাই যতটা পারি।'

একথা শুনে রাখালের দল হো হো করে হেসে উঠল। তারা তাকে মনিব গৃহিণীর চাতুরী ও তার রোগা হবার কারণটি বুঝিয়ে দিল। রাখাল সেদিন গরু চরিয়ে বাড়ীতে উপস্থিত হওয়ামাত্র ব্রাহ্মণী অভ্যাস মত যেই বলে উঠলেন—

গরু চরাইয়ে এল যাদুমণি,
খেতে দাও ফেন আমানি।

তখন রাখাল মাথা নেড়ে বললে :

সেদিন আর নাই বাম্‌নি
আজ আগে ভাত পরে আমানি।

সিন্দুকের কাছে টাকা ধার করা :

এক কৃপণ ব্যক্তির ছিল একটি সিন্দুক। সিন্দুকটিতে থাকত তার টাকা পয়সা। সিন্দুকের মধ্যে একবার টাকা রেখে দেবার পর আর

সেই টাকা সে কোন কিছুতেই খরচ করত না। মনে করত ও টাকা তার নয় টাকার মালিক সিন্দুক। তাই সিন্দুকের টাকা খরচ করার অর্থ পরের অর্থ ব্যয় করা। যদি কখনও খুব প্রয়োজনে তাকে সিন্দুক থেকে টাকা নিতে হ'ত, সে তখন সিন্দুককে বলে নিত যে সিন্দুকের কাছ থেকে সে টাকাটা ধার নিচ্ছে, পরে যথাসময়ে শোধ দিয়ে দেবে।

হরিঘোষের গোয়াল ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কলকাতার দেওয়ান হরি ঘোষ হেদোর কাছে বাস করতেন। হরি ঘোষের ছিল একটি বিশালাকৃতির বৈঠকখানা। অসংখ্য নিষ্কর্মা ব্যক্তি এখানে দীর্ঘ সময় ধরে আড্ডা মারত। গল্পগুজব ছাড়াও এখানে তারা গাঁজা খেত এবং তামাক টানত। বৈঠকখানায় আড্ডারতদের পেটের চিন্তা করতে হত না। হরিঘোষের ছিল অবারিত দ্বার। তাঁর ভোজনাগারে যে যখন উপস্থিত হত, তখনই তার খাওয়া জুটত। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় হরি ঘোষ সক্রিয়ভাবে ত্রাণ কার্যে অংশ নিয়েছিলেন।

হিঙ্গা তুই মোর গাঁয়ে যা ঃ

গৌড়ের সুলতান তখন ফিরোজ শা। তাঁর ইচ্ছা হ'ল একটি সুউচ্চ মিনার নির্মাণ করবেন। অতএব মিনার তৈরীর উপকরণ সংগৃহীত হল, নিযুক্ত হ'ল রাজমিস্ত্রী। যথাসময়ে মিনার নির্মাণের কাজ শেষ হলে সুলতান সরেজমিনে দেখতে গেলেন। সঙ্গে গেল তাঁর খাস চাকর হিঙ্গা।

বাদশা মিনার দেখে খুব হতাশ হলেন। কারণ মিনার বাদশার ইচ্ছামত উঁচু হয়নি। রাজমিস্ত্রী জানালে সে কিন্তু অনেক বড় মিনার নির্মাণ করতে পারত, পারেনি শুধু উপকরণের অভাবের জন্য।

রাজমিস্ত্রীর কথায় বাদশা ত ক্ষেপে আগুন। বাংলার সুলতান কি না একটা উঁচু মিনার তৈরীর প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করতে অপারগ! বাদশা বললেন, রাজমিস্ত্রী উপকরণের কথা তাঁকে জানালেই পারত।

যাই হোক ক্ষুব্ধ বাদশার নির্দেশে রাজমিস্ত্রীকে সদ্য নির্মিত মিনার থেকে নীচে ফেলে দেওয়া হল। বেচারীর মৃত্যু হ'ল।

এইবার নবাব হিঙ্গাকে নির্দেশ দিলেন, 'হিঙ্গা তুই মোর গাঁয়ে যা'। বেচারী হিঙ্গা বাদশার রুক্ষ মেজাজ দেখে আর সাহস করে বলতে পারল না কি জন্যে সে মোর গাঁয়ে যাবে। সে পত্র পাঠ মোর গাঁয়ে হাজির হ'ল। এখানে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে হিঙ্গার দেখা। ব্রাহ্মণের নাম সনাতন। ব্রাহ্মণ হিঙ্গাকে মোর গাঁয়ে উপস্থিত হবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হিঙ্গা আনুপূর্বিক সব বিবরণ দিল। বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ রাজার অভিপ্রায়ের কথা বুঝে নিলেন। তিনি হিঙ্গাকে পরামর্শ দিলেন মোর গাঁ থেকে ভাল ভাল রাজমিস্ত্রী সংগ্রহ করে বাদশার কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করতে।

সেইমত হিঙ্গা কয়েকজন ভাল রাজমিস্ত্রী সঙ্গে নিয়ে বাদশার কাছে গৌড়ে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

বাদশা তো হিঙ্গাকে রাজমিস্ত্রীদের নিয়ে উপস্থিত হতে দেখে অবাক। তিনি তো হিঙ্গাকে তাঁর অভিপ্রায়ের কথা কিছুই বলেননি, তবু সে কি করে তাঁর অভিপ্রায়মত কাজ করলে? নবাবের প্রশ্নের উত্তরে হিঙ্গা মোর গাঁয়ের সনাতন ব্রাহ্মণের পরামর্শের কথা বললে। বাদশা সনাতনের বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়ে খুব মুগ্ধ হলেন। তিনি সনাতনকে আনিয়ে তাঁর রাজ্যের মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করলেন। আর মোর গাঁয়ের রাজমিস্ত্রীদের দিয়ে তিনি যে সুউচ্চ মিনার নির্মাণ করালেন সেটি পরিচিত হ'ল ফিরোজ মিনার নামে। এখনও কাউকে কোন কাজ ভাল করে না বুঝিয়ে প্রেরণ করা উপলক্ষে প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

সূত্রপঞ্জী ঃ

(ক) পত্র-পত্রিকা—

বামাবোধিনী পত্রিকা ; ৩৪৬ সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩০০ (নভেম্বর, ১৮৯৩), ৫ম কল্প ; ২য় ভাগ।

প্রবাদ প্রসঙ্গ ; দীনেন্দ্রকুমার রায় ; ভারতী (১৩০৩)।

দীনেন্দ্রকুমার রায় ; ভারতী (১৩০৪)

প্রবাদ প্রসঙ্গ ; শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, ভারতী (আশ্বিন, ১৩০৫)।

প্রবাসী (মাঘ, ১৩১১)।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; প্রবাসী (চৈত্র, ১৩২০)।

আর্য্যাবর্ত্ত ; হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ; ১৩১৯।

ভারতবর্ষ ; ৪র্থ সংখ্যা ; (আশ্বিন, ১৩২০)।

সোমরেজ আলী খাঁ ও ভবনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদকের বৈঠক; ভারতবর্ষ, (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০)।

গ্রাম্য গাথা ও প্রবচন ; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষ ; (মাঘ, ১৩২৩)।

যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অর্চনা (আষাঢ়, ১৩৩০)।

অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়, শুকতারা , (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪)।

মানভূমের প্রবাদ ; সুবোধ বসু রায় ; অরণ্যলোক (১৩৮৬)

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূতনাথ কুণ্ডু ; পশ্চিম সীমান্ত বাংলার প্রবাদ ও গল্পের আবাদ, অরণ্যলোক (১৩৮৬)।

অরুণ প্রকাশ সিংহ ; ছত্রাক (১৩৮৩)।

ঐ (ছত্রাক ; সাহিত্য সংখ্যা, (১৩৮৪)

খেলাই চণ্ডীর মেলা, সিরাজুল হক ; ছত্রাক (১৩৮৫)।

মানভূমী কহনী ; অনিল মাহাতো, ছত্রাক (১৩৯০)।
প্রবাদের নিধিরাম সর্দার ; শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় ; রবিবাসরীয় ;
৭ই জুলাই, ১৯৮৫।

(খ) গ্রন্থাদি—

প্রবোধচন্দ্রিকা ; পঞ্চম কুসুমের প্রথম স্তবক ; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।
(তৃতীয় মুদ্রণ, ১৮৬২) প্রবাদমালা ; রেভারেণ্ড লঙ্ ; নবপত্র
প্রকাশন (১৮৭২) ; পৃঃ ২৩, ৩১, ৪৩, ৪৯, ৫৪, ১১৮, ১২৮।
প্রবাদ পদ্ম (১ম ভাগ) ; চন্দ্রভূষণ শর্মামণ্ডল (১৯২৫)।
সরল বাঙ্গালা অভিধান ; (৩য় সংস্করণ) ; সুবলচন্দ্র মিত্র।
প্রবাদ-রত্নাকর ; সত্যরঞ্জন সেন।
বাংলা প্রবাদ ছড়া ও চলতিকথা ; ড. সুশীলকুমার দে।
লোক সাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ ; মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন-কাসিমপুরী সংকলিত ; (১৯৬৯)।
সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ ; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(গ) ব্যক্তি—

অধ্যাপক নীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, মোহন সিংহ এবং
ড. অজিত কুমার কর।

এখনকার দিনে যদিও আগেকার আমলের মত কথায় কথায় প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার নেই, তবু প্রবাদের ব্যবহার যে একেবারে উঠে গেছে তাও নয়। আজও আমরা নানা উপলক্ষ্যেই প্রবাদের ব্যবহার করি। একাধিক প্রবাদ-সংকলনও রয়েছে, উৎসাহী পাঠক এসব সংকলন নাড়া চাড়াও করে থাকেন। কিন্তু যা নেই তা হ'ল প্রবাদের উৎস সন্ধানের রহস্য ভেদ। সব প্রবাদ না হলেও, বহু প্রবাদের উৎপত্তির মূলেই নানা ধরণের গল্প সংশ্লিষ্ট ছিল। এসব গল্পের অনেকগুলি যেমন কাল্পনিক, তেমনি অনেকগুলি আবার সত্যি। আজ দীর্ঘকালের ব্যবধানে গল্পের হারগুলি হারিয়ে গেছে, রয়ে গেছে প্রবাদরূপ লকেটগুলি। তার ফলে বহু প্রবাদের প্রকৃত তাৎপর্য আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। দীর্ঘ-দিনের পরিশ্রমে প্রায় দেড়শতাধিক প্রবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাহিনীগুলি উদ্ধার করে তারই সংকলন প্রকাশিত হল। যাঁরা প্রবাদের ব্যাপারে কৌতূহলী নন, তারাও সংকলিত গল্পগুলির রস আস্বাদন করে যে প্রীত হবেন তা বোধহয় হলফ করেই বলা যায়।

প্রচ্ছদ ঃ অমিয় ভট্টাচার্য